দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

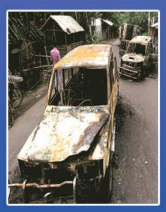

বাদুড়িয়া-বসিরহাটের অশনি সঙ্কেত
— পৃঃ ১৪

চীন-ভারত সংঘাত কি অনিবার্য ?
— পৃঃ ১৯



৬৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ২৪ জুলাই ২০১৭।। ৭ শ্রাবণ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

চীনের দাদাগিরিই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের বড় বাধা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ৭ শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৪ জুলাই - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

ভুটানের ডোকলামে চীনের দাদাগিরিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ভারত ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : মমতা কমিশন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধামা' রাজ্যের সেরা শিল্প ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তাই সন্দেহজনক

▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

বাদুড়িয়া-বসিরহাটের অশনি সঙ্কেত

▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১৪

রোহিঙ্গাদের দিয়ে জম্মু দখলের ছক জঙ্গিদের ▯ ১৭

ভারত-চীন সংঘাত কি অনিবার্য?

▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৯

ডোকলাম সঙ্কটের মূলে রয়েছে চীনের দাদাগিরি

▯ সোহম মিত্র ▯ ২১

স্বাধীনতার ৭০ বছর পর ভারত এক বাজারসূত্রে আবদ্ধ

▯ জয় পণ্ডা ▯ ২৭

গোরক্ষা-গোহত্যা ও আমরা ▯ গোপীনাথ দে ▯ ৩০

সীতা— অগ্নিপরীক্ষা থেকে পাতাল প্রবেশ

▯ রাকেশ দাশ ▯ ৩১

নাট্যজগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব মন্মথ রায়

▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ৩৩

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯** ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৭** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা, শব্দরূপ : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষ

নকশালদের রাষ্ট্রদ্রোহী আন্দোলন

নকশালদের রাষ্ট্রদ্রোহী আন্দোলনে ভারতের অনেক রক্ত ঝরেছে। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে অনেক সম্ভাবনা। দেশকে নিঃসন্দেহে ব্যথিত এবং লজ্জিত করেছে এই আন্দোলন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে নকশাল আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক দিক নিয়ে আলোচনা। এছাড়া প্রকাশিত হবে ইজরায়েল এবং ভারতের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি প্রতিবেদন। লিখেছেন— সাধন পাল, মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী প্রমুখ।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার



স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মুখোমুখি

চীন-ভারত সংঘাত ক্রমেই অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। চীনের বিশ্বাসঘাতকতাই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন কুটনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ। ২০১২ সালে চীন ও ভারতের মধ্যে চুক্তি হইয়াছিল যে, ভারত, চীন ও অন্য কোনো দেশের সীমান্ত যেইখানে মিলিয়াছে, সেইখানে সীমান্ত সংক্রান্ত কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হইলে তাহা সেইসব দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই মীমাংসা করিতে হইবে। বস্তুত চীন সেই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছে।

ঘটনার সূত্রপাত ভারত-ভুটান-চীন সীমান্ত সংযোগস্থল ডোকলামে চীনের একতরফা ভাবে সড়ক নির্মাণ শুরু করার মধ্য দিয়ে। ভুটানের দাবি ডোকলাম তাহাদের এলাকা। চীনের বক্তব্য বাণিজ্য প্রসারের দৃষ্টিতেই তাহাদের এই সড়ক নির্মাণ। কিন্তু ভারতের সমর বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন যে, সামরিক উদ্দেশ্যেই চীন এই সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছে। গত মাসে ভারতীয় সেনা চীনের সড়ক নির্মাণে বাধা দেওয়াতেই সংঘর্ষের পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে।

তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করিতেছেন, ভারতের চীনের দাদাগিরিকে আমল না দেওয়াও এই পরিস্থিতি উদ্ভবের একটি কারণ। দক্ষিণ চীন সমুদ্র উপকূলের সমস্ত দেশের সহিত ভারতের সুসম্পর্ক তৈরি হইয়াছে। তাহারাও আর চীনের দাদাগিরি মানিতে নারাজ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানের একমাত্র মদতদাতা হইল চীন। চীন মনে করিতেছে ভারত ১৯৬২ সালেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা মাঝে মাঝেই সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহার মোক্ষম জবাবও ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি দিয়া বলিয়াছেন—এখন ২০১৭ সাল, ১৯৬২ নহে।

বস্তুত ভারত আজ কাহারও চোখরাঙানিকে ভয় পাইবার পাত্র নয়। ভারত-ভুটান-চীন সীমান্তে সংঘর্ষের খবরের মধ্যে আরও একটি খবর হইল, জাপান ও আমেরিকার নৌসেনা মহড়ার সঙ্গে ভারতীয় নৌসেনাও শামিল হইয়াছে। সম্প্রতি এই তিন দেশের নৌসেনা দশদিবসীয় মালাবার শৃঙ্খলায় (নৌ মহড়া) যুক্ত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় চীন যদি উগ্র আচরণ করে ভারত তাহার সমুচিত জবাব দিতে বদ্ধপরিকর। ভারতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্রগুলির নিশানায় বেজিংও রহিয়াছে। পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরের নিশানায় আঘাত হানিবার মতো ক্ষেপণাস্ত্র ভারতের হাতে রহিয়াছে। তাই ভারত কিছুতেই আর চীনের দাদাগিরিকে বরদাস্ত করিবে না।

চীনের সামরিক শক্তির ঔদ্ধত্যের মোক্ষম জবাব দিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে দেশভক্ত ভারতবাসীকে সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে চীনকে ভাতে মারিবার। চীনা পণ্য সামগ্রীর ব্যবহার বয়কট করিলে তাহাদের টনক নড়িবে। এই সহজসরল সত্যটিকে আজ দেশবাসীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দেশবাসীকেও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শামিল হইতেই হইবে।

সুভাষিতম্

ধর্মসংস্কৃতিসম্পন্নং ধীরোদাত্তগুণান্বিতম্।
সঙ্ঘশক্তি বিনা রাষ্ট্রং ন ভবেদ্ জগদাদৃতম্।।

সংগঠিত শক্তি ব্যতীত উত্তম ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসম্পন্ন, ধীরোদাত্ত গুণে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রকেও পৃথিবীর লোকেরা সম্মান করে না।

ভারত সতর্ক করল পাকিস্তানকে, নিয়ন্ত্রণরেখা পেরোলেই উচিত শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাতশো আটাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর চলছে ভয়ঙ্কর লড়াই। ঠিক এই সময় তীব্র ভাষায় ইসলামাবাদকে সতর্ক করে ভারত জানিয়ে দিল, পাকিস্তান যদি ভারতীয় সেনাদের লক্ষ্য করে গোলাগুলি ছোঁড়ে কিংবা জঙ্গিদের সীমান্ত পার করিয়ে এদেশে ঢোকানোর চেষ্টা করে তাহলে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। ভারতের মিলিটারি অপারেশনের ডিজি জেনারেল এ.কে. ভাট এক কড়া বার্তায় সম্প্রতি পাকিস্তানের জেনারেল শাহির সামশাদ মিরজাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করলে ভারতীয় সেনা তার জবাব দেবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'জেনারেল ভাট বলেছেন, নিয়ন্ত্রণরেখার আশপাশের



অঞ্চলে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে ভারতীয় সেনা সর্বদাই তৎপর। কিন্তু সেই তৎপরতা উভয়পক্ষের তরফ থেকে দেখানো দরকার। অথচ পাকিস্তানের ডিজিএমও ক্রমাগত জঙ্গি অনুপ্রবেশে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। তার কথাতেই প্রমাণ পাকিস্তান ভারতীয় সেনাদের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ থামাতে চায় না।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, হিজবুল মুজাহিদিন নেতা সালাউদ্দিনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা হলেও, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকাঠামোয় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনেনি। নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বিভিন্ন বর্ডার পোস্টে এখনও পাকিস্তানি সেনার তত্ত্বাবধানে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর ভারতীয় সেনাদের ব্যস্ত রেখে চলে জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশ পর্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল ভাটের সতর্কবার্তা তাৎপর্যপূর্ণ। এটা একরকম বুঝিয়ে দেওয়া ভারত আর কারও ওপর নির্ভর করতে রাজি নয়। ভারতে ঢুকলেই মার খেতে হবে। সে জঙ্গি হোক বা পাকিস্তানি সেনা।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত
ভারতে গোমাংসের উৎসব দুর্ভাগ্যজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গোমাংস ভক্ষণ এবং সম্প্রতি সারাদেশে গোমাংসের উৎসব (বিফ ফেস্টিভ্যাল) প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চের (আই সি এস এস আর) চেয়ারপার্সন ব্রজবিহারী কুমার বলেন, গোরুর প্রতি ভারতের নব্বই শতাংশ মানুষ সংবেদনশীল। তাই এদেশে গোমাংসের উৎসব করলে তাদের আবেগ আহত হয়। তিনি আরও বলেন, কিছু ঐতিহাসিক আদর্শের প্রতি অনুগত থাকার জন্য হিন্দুদের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে ভালোবাসেন। তাঁর মন্তব্য, 'অনেক ঐতিহাসিক আদর্শকে বোঝার মতো বয়ে বেড়ান। তাঁদের এই বোঝা থেকে মুক্ত করা দরকার।' আইসিএসএসআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আইসিএসএসআর এখনও পর্যন্ত যেসব গবেষণা করেছে আমি তাতে একেবারেই খুশি নই। সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রথা, প্রকরণ এবং সংস্কৃতি সবই আমাদের বদলাতে হবে।' তাঁর মতে একই বিষয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার চর্চা করার থেকে যেসব বিষয় অচর্চিত সেগুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। 'ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য' শীর্ষক একটি সেমিনারে ভাষণ দিতে গিয়ে ব্রজবিহারী কুমার প্রাচীন ভারতে অস্পৃশ্যতা ছিল না বলে দাবি করেন। তখনকার জাতিবিভাগ ছিল পেশাভিত্তিক। তিনি বলেন, আলবিরুনি মাত্র চারটি জাতের কথা লিখে গেছেন। তাহলে আধুনিক ভারতে হাজার হাজার জাত কোথা থেকে এল? তাঁর মতে এর কারণ মূলত দুটি। স্থানীয় ভিত্তিতে বিবাহ এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ। স্বাধীনতার পর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক হিন্দুদের জাতপাতের কথা অযথা রঙ চড়িয়ে লিখেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

গঙ্গার একশো মিটারের মধ্যে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হরিদ্বার থেকে উন্নাও (উত্তরপ্রদেশ) অঞ্চলে গঙ্গার ১০০ মিটারের মধ্যে যে কোনো নির্মাণ নিষিদ্ধ করল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। এই অঞ্চলটিকে 'নির্মাণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প-বহির্ভূত' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, যদি কোনো ব্যক্তি গঙ্গায় বর্জ্য ফেলে দূষণের সৃষ্টি করেন তা হলে তাকে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অ্যাডভোকেট এস.সি. মেহতার দাখিল করা পিটিশনের জবাবে ৫৪৩ পাতার রায় দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। তাতে বলা হয়েছে, হরিদ্বার থেকে উন্নাও— এই অঞ্চলে গঙ্গা বা তার কোনো শাখানদীর ৫০০ মিটারের মধ্যে বর্জ্য ফেলা যাবে না। জলাজমিও বোজানো যাবে না। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারপার্সন স্বতন্তার কুমারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ গঙ্গা ক্যানেলে জল সরবরাহের অজুহাতে মূল গঙ্গার পরিবেশগত অবমূল্যায়ন করা যাবে না বলে রায় দেয়। গঙ্গার আশেপাশে যেসব ড্রেন এবং ভূগর্ভস্থ নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে অবিলম্বে তার সুষ্ঠু সংস্কারের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল।

হিন্দু সন্ত্রাসবাদ ইউপিএ-র আমদানি

ভাগবতকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র ফাঁস



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইসলামি সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার যে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' আমদানি করেছিল— এই অভিযোগের সত্যতা ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহন ভাগবতকে সন্ত্রাসে মদতদাতা হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছিল। এরকম একটি বিস্ফোরক সংবাদ সম্প্রতি এক বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ইউপিএ শাসনের শেষের দিকে দেশ জুড়ে যে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের ঢেউ তোলা হয়েছিল, তাতে শ্রীভাগবতের নাম জড়িয়ে দেওয়ার সরকারি প্রস্তাব স্পষ্টতই ছিল--- সম্প্রতি একটি সরকারি নথিতে এরকমই তথ্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। আজমেড় ও মালেগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘটানো ভয়াবহ বিস্ফোরণের মোকাবিলায় ইউপিএ সরকার 'হিন্দু সন্ত্রাস'-এর তত্ত্ব আমদানি করে। আর এই সূত্রেই সন্ত্রাসের কালো তালিকায় শ্রীভাগবতের নাম জড়িয়ে দেওয়ার জন্য এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি)-র শীর্ষ আধিকারিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে।

আজমেড় ও অন্যান্য বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত অভিনব ভারতের ক্ষেত্রে শ্রীভাগবতের ভূমিকা রয়েছে— এই অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব করা হোক। ইউপিএ সরকারের তরফে এনআইএ-র তদন্তকারী অফিসারদের এই মর্মে এক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে-সহ ইউপিএ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী তদন্তকারী অফিসারদের সরাসরিই নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীভাগবতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনআইএ-র জিম্মায় নেওয়া হোক। ২০১৪ সালে ইংরেজি ম্যাগাজিন 'ক্যারভান'-এ স্বামী অসীমানন্দের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পর এনআইএ-র উপর এই চাপ বাড়তে থাকে। কিন্তু এনআইএ-র তৎকালীন প্রধান শরদ কুমার ওই সাক্ষাৎকারের আদালতগ্রাহ্য রেকর্ড চেয়ে পাঠান। সেই রেকর্ড না পাওয়ায় এনআইএ আর বিষয়টি নিয়ে এগোয়নি।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় সরকার তা নিয়ে যথাযথ ভাবনা-চিন্তা করবে। তবে তিনি মনে করেন, পুরো বিষয়টা জনসাধারণের বিচারের জন্য প্রকাশ্যে আসা দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত দুই সন্দেহভাজনকে কোনও রকম তদন্ত ছাড়াই সরকারের পক্ষ থেকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল।

ইরাকে জেনারেল ভি.কে. সিংহ

মসুল থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥



মসুল থেকে আই এস আই এস জঙ্গিদের বের করে দেওয়া মাত্র বিদেশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ভি.কে. সিংহ ইরাকে পৌঁছে গেলেন। উদ্দেশ্য, জঙ্গিদের কাছে জামিন হিসেবে রক্ষিত ৩৯ জন ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা। ভারত সরকারের এহেন মানবিক উদ্যোগে ইরাক সরকার এবং সে দেশের সেনা সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবারের ইরাক সফরে জেনারেল ভি.কে. সিংহ মসুলের প্রধান অঞ্চলগুলিতে যোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করে তিনি নিখোঁজ ভারতীয়দের কীভাবে খুঁজে বের করা হবে সে ব্যাপারে তদারকি করেন। পেশমারগারা তাঁকে মসুলের ভৌগোলিক বিবরণ, পরিবেশ এবং খোঁজার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করেন। পরে তিনি ইরাকের বিদেশমন্ত্রী ড. ইব্রাহিম আল জাফারির সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বন্দি ভারতীয়দের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি তাদের জানান। খবরে প্রকাশ, একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাজে যোগ দিতে ভারতীয়রা মসুলে গিয়েছিলেন। পরে তাদের একটি ফার্ম হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পণবন্দি হিসেবে স্থানান্তরিত হন পশ্চিম মাসুলের জেলে। এরা সকলেই পঞ্জাবের। ২০১৪ থেকে বন্দি থাকলেও, এরা সকলেই জীবিত। ইরাকি সরকার অবিলম্বে ভারতীয়দের খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ জারি করেছে। ভারতীয় দূতাবাসকেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারত-জাপান-আমেরিকার 'কনসার্টে' জমজমাট মালাবার ২০১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত জাপান আমেরিকার মতো তিন সুপার পাওয়ারের সম্মিলিত নৌমহড়া এবং সমন্বয়ের প্রদর্শনীতে জমজমাট হয়ে উঠেছিল মালাবার ২০১৭। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, 'বঙ্গোপসাগর-ভারত মহাসাগরের বুকে এত বড়ো নৌমহড়া এর আগে কখনও হয়নি।' প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মোট ২১টি যুদ্ধ জাহাজ, ১০০টি বিমান, ২টি সাবমেরিন এবং সহস্রাধিক নৌ এবং বায়ুসেনা এই মহড়ায় অংশ নিয়েছিল। ভারত এবং আমেরিকার যুদ্ধবিমানকে



এক সঙ্গে উড়তে দেখা একটা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা বলে জানিয়েছেন দর্শকেরা। ভারতীয় নৌসেনা থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, মিগ ২৯-কে যুদ্ধবিমান ভারতের বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরী আই এন এস বিক্রমাদিত্যের ডেক থেকে আকাশে ওড়ে। একই সময়ে মার্কিন রণতরী ইউএসএস নিমিৎজের ডেক থেকে উড়ান শুরু করে এফ-১৮ যুদ্ধবিমান। সে এক বিরল দৃশ্য! ভারতের আইএনএস জ্যোতি মার্কিন রণতরী ইউএসএস স্যুপ এবং জাপানি রণতরী শাজানামির সঙ্গে বিশেষ মহড়ায় অংশ নেয়। ডেক থেকে ডেক উড়ানের প্রদর্শনী করে মার্কিন নৌবাহিনী। একটি হেলিকপ্টার মার্কিন রণতরী ইউএসএস স্যুপ থেকে উড়ে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ সহ্যাদ্রির ডেক থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কিন রণতরীর ডেকে গিয়ে পৌঁছয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত-যৌথ মহড়া ১৯৯২ থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু ২১তম সংস্করণ মালাবার ২০১৭ পাকিস্তান তো বটেই, চীনেরও মেরুদণ্ড দিয়ে হিমেল স্রোত বইয়ে দিয়েছে। তিনটি দেশের বোঝাপড়া যদি এই পর্যায়ে থাকে তাহলে যে-কোনও সামরিক সিদ্ধান্ত নেবার আগে চীনকে যে দু'বার ভাবতে হবে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রামপুর সেনা ছাউনিতে হামলার মাথা মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াডের (এটিএস) যৌথ উদ্যোগে রামপুর সিআরপিএফ ছাউনিতে জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড লস্কর-ই-তৈবার নেতা সেলিম মুকিম খান ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। সেলিম উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে আগেই লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছিল। ১৭ জুলাই মাঝরাতে দুবাই পালিয়ে যাবার সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের রামপুরে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর ছাউনিতে আত্মঘাতী হামলায় সেলিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেলিমের সঙ্গে কওসর এবং শরিফ নামে আরও দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এরা তিনজনেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফ্‌ফরনগরে জঙ্গি প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। অন্যদিকে, ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় দু'জন পাক জঙ্গি নিহত হয়েছে। সেই সঙ্গে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশও বন্ধ করা গেছে বলে জানিয়েছেন সেনা কর্তৃপক্ষ।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ : সুষমা স্বরাজ সুপারিশ ছাড়াই সেখানকার রোগীদের চিকিৎসা ভিসা



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাক অধিকৃত কাশ্মীর কথাটির কোনও অর্থ হয় না। কাশ্মীর দখল করার পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের লালসাকে আক্রমণ করে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাকিস্তানের 'কাশ্মীর-দাবি' সম্পূর্ণ বেআইনি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের কোনও মানুষ ভারতের যে-কোনও প্রান্তে চিকিৎসা করাতে চাইলে তাকে মেডিক্যাল ভিসা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী সরতাজ আজিজের কোনো সুপারিশ লাগবে না। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা এক রোগীর লিভারে টিউমার ধরা পড়ে। সুচিকিৎসার জন্য তিনি দিল্লিতে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী সরতাজ আজিজ সুপারিশপত্র লিখতে অস্বীকার করেন। অসুস্থ ওসামা আলি তখন উপায়ান্তর না পেয়ে সরাসরি মেডিক্যাল ভিসার জন্য সুষমা স্বরাজের কাছে আবেদন করেন। সম্প্রতি সুষমা স্বরাজ জানিয়েছেন, ওসামা আলিকে চিকিৎসা ভিসা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার জন্য সরতাজ আজিজের সুপারিশ লাগবে না। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের কড়া কূটনৈতিক পদক্ষেপ চলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করে দীর্ঘদিন ধরে গিলগিট বালটিস্তান অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জঙ্গিদের অবাধ প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে ভারতের বিরুদ্ধে নানা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে ব্যবহার করছে সেখানকার মানুষকে।

বাতিল নোট জমা দিতে বাড়তি সময়

সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাব খারিজ করল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যারা বৈধ কোনও কারণবশত গত বছর ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০০ ও ১০০০ টাকার বাতিল নোট জমা দিতে পারেননি তাদের জন্য বাড়তি সময় বরাদ্দ করতে কেন্দ্রকে প্রস্তাব দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু কেন্দ্র সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের যুক্তি, এই সুযোগ দেওয়া হলে অনেকেই তার অপব্যবহার করবেন। এফিডেবিটের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রক সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, 'বাড়তি সময় দেওয়া হলে বিমুদ্রীকরণ এবং দেশ থেকে কালোটাকা নির্মূল করার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ যারা এখনও টাকা জমা দেননি তারা ভাবনাচিন্তা করে টাকা জমা না দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য অজুহাত খাড়া করার সময় পেয়ে যাবেন।' আরও বলা হয়েছে, 'বিমুদ্রীকরণের পর অবৈধ লেনদেনের যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে এটা স্পষ্ট, যদি বাড়তি সময় দেওয়া হয় তাহলে এই ধরনের লেনদেন আরও বেড়ে যাবে। এমনকী বাতিল নোট কম দামে বিক্রি করার ঘটনাও ঘটতে পারে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ মাসের গোড়ায় একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছিল, যদি কোনও ব্যক্তি ৮ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকেন তাহলে তিনি কীভাবে বাতিল নোট জমা দেবেন? তার মতো যাদের বাতিল নোট সময়মতো জমা না দেবার বৈধ কারণ রয়েছে তাদের জন্য বাড়তি সময় বরাদ্দ করুক কেন্দ্র। তার জবাবেই কেন্দ্র এফিডেবিট দিয়ে জানিয়েছে, 'এর ফলে বেনামি সম্পত্তি কেনাবেচা বেড়ে যাবে। তাছাড়া কে বৈধ আর কে অবৈধ বাছতে গিয়েও ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হবার দশা হবে মন্ত্রকের।'



উবাচ



"আদর্শবাদ, কঠোর পরিশ্রমই আমার সাফল্যের চাবিকাঠি।"

এই পদে প্রার্থী হিসেবে এনডিএ-র তাঁকে মনোনয়নের প্রসঙ্গে

বেঙ্কাইয়া নাইডু
উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী



"যে-কোনও মূল্যে হত্যাকারীদের হাত থেকে আমাদের পবিত্র গোবংশকে রক্ষা করব। এজন্য কোনও সমালোচনাকেই গ্রাহ্য করা উচিত নয়।"

প্রবীণ তোগাড়িয়া
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের
আন্তর্জাতিক সভাপতি



"এই হামলার পর ক্ষতিগ্রস্ত তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করতে কাশ্মীরিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। রাজ্যের মুসলমান সমাজ এই ঘটনার তীব্র নিন্দে করেছে। একে মানবতার ওপর হামলা বলে প্ল্যাকার্ড লেখা হয়েছে।"

অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ওপর জঙ্গিদের হামলা প্রসঙ্গে

নির্মল সিংহ
জম্মু ও কাশ্মীরের
উপমুখ্যমন্ত্রী



"যখন লুঠেরাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তখন সেটাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলা হচ্ছে। এইসব লোকেদের বিরুদ্ধে সব দলেরই একসঙ্গে হওয়া দরকার।"

সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রাক্কালে দলীয় নেতাদের উপস্থিতিতে

প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদী



"গোধরা কাণ্ডের পর নীতীশ কুমার বিজেপির সঙ্গে ছিলেন। এবং তারপরও। আমার মনে হয়, তাঁর অবস্থান বুঝতে এটাই যথেষ্ট।"

সম্প্রতি তেজস্বীকে নিয়ে জেডিইউ ও আরজেডি-র দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে

সুশীল মোদী
বিহারের বিজেপি নেতা

ভুটানের ডোকলামে চীনের দাদাগিরিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ভারত

সেই ১৯৬২ সালের পর চীন-ভারত সামরিক সংঘাতের অশনি সঙ্কেত পুনরায় দেখা দিয়েছে। সেবার অরুণাচল প্রদেশকে চীনের অংশ বলে দাবি করে লালফৌজ যুদ্ধে অপ্রস্তুত ভারতকে পরাজিত করে অরুণাচলের অর্ধেক দখল করে নেয়। সেই জবর দখল আজও চলছে। এবার চীন ভুটানের ডোকলাম উপত্যকাকে তিব্বতের অংশ বলে দাবি করে বিপুল সংখ্যক লালফৌজ পাঠিয়েছে দখলের উদ্দেশ্যে। যে জরুরি কথাটা চীনের কমিউনিস্ট শাসকরা ভুলে গেছেন তা হচ্ছে ১৯৬২ সালে সামরিকভাবে দুর্বল ভারত ২০১৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় এখন অতি শক্তিশালী দেশ। ভারত বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। ভারতের সামরিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার আগে বেজিংকে শতবার চিন্তা করতে হবে। ডোকলামে লালফৌজ পাঠিয়ে ভারতকে পিছু হঠতে বাধ্য করা যাবে না। একমাত্র দিল্লি-বেজিং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই সীমান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। এই সহজ কথাটা বেজিংকে বুঝতে হবে। কিন্তু চীন চাইছে দিল্লি নয়, সামরিকভাবে দুর্বল ভুটানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে ডোকলামে তার আধিপত্য বিস্তার করতে।

ভারতের দিক থেকে চীনের সঙ্গে ডোকলাম সংঘাত অতীতের অন্যান্য সীমান্ত বিরোধের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের হচ্ছে 'শিলিগুড়ি করিডোর'। ভুটানের ডোকলাম থেকে যার দূরত্ব বেশি নয়। চীন যদি ডোকলাম দখল করে তাহলে শিলিগুড়ি করিডোর, যাকে সংবাদমাধ্যমে 'চিকেন নেক' বলা হচ্ছে, সেটিকে বিচ্ছিন্ন করতে বেজিং সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। এটিকে বিচ্ছিন্ন করলে দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। চীন গত ছয় দশক ধরে ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকাকে দখল করার জন্য সেখানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র অর্থের জোগান দিচ্ছে। পাকিস্তান যেমন কাশ্মীর চায়, তেমনি চীন উত্তর-পূর্ব ভারতের দখল চায়। এই কারণে, ভারত কিছুতেই ডোকলামে চীনের আধিপত্য মানতে রাজি নয়। চীনের দাবি, এই উপত্যকাটি অতীতে তিব্বতের অংশ ছিল। এখানে ইয়াক চরাতে ভুটানিরা

গূঢ় পুরুষের

কলম

আসতেন। তার জন্য তিব্বতের রাজাকে নিয়মিত কর দিতেন ভুটানের রাজা। যে সময়ের কথা চীন আজ বলছে তখন ভারতে ব্রিটিশ রাজ শুরু হয়নি। তিব্বত ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। তাছাড়া ডোকলাম যে তিব্বতের অংশ ছিল এমন প্রমাণ চীন দেখাতে পারেনি। শুধু মুখে বলেছে যে ব্রিটিশ শাসকরা জোর করে ডোকলাম উপত্যকাকে ভুটানের বলে চিহ্নিত করে। ঠিক এইভাবেই ব্রিটিশ শাসকদের ম্যাকমোহন লাইনকে নস্যাৎ করে ১৯৬২ সালে চীন অরুণাচলকে চীনের অংশ বলে জবরদখল করেছিল।

ডোকলামে ভারতীয় সেনা ঢুকেছে 'বন্ধু দেশ' ভুটানের জমি রক্ষা করতে। ১৯৪৯ সালে ভুটানের সঙ্গে ভারতের শান্তিচুক্তি হয়। সেই চুক্তিতে বলা হয় যে প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভুটান ভারতের পরামর্শ মেনে চলবে। কিন্তু গত ২০০৭ সালে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে দিল্লির কর্তারা মেয়াদ বাড়াতে উদ্যোগ নেয়নি। বাস্তব হচ্ছে, রাজীব গান্ধী থেকে মনমোহন সিংহ সকলেই চীনের সামরিক শক্তিকে সমীহ করে চলেছিলেন। চীনের হুমকির কাছে মাথা নত করাটাই ছিল কংগ্রেসের বিদেশ নীতি। নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি লালফৌজের রক্তচক্ষুকে ভয় পাননি। তাই আজ ডোকলামে ভারতীয় সেনা সাহসের সঙ্গে লালফৌজের মোকাবিলায় শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লড়াইটা এখন সমানে সমানে। চীন অরুণাচলে দলাই লামার সফরে তীব্র আপত্তি জানায়। মোদীজী সেই আপত্তিকে পাত্তা দেননি। তাছাড়া তাঁর নির্দেশের জন্য চীন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট দিয়ে বালুচিস্তানের গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত অর্থনৈতিক করিডোর গড়তে পারেনি। ১৯৬২ সাল নেহরু- কৃষ্ণমেননের মূর্খামির জন্য চীনের সঙ্গে যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর এই প্রথম ভারত বার্তা দিয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের দাদাগিরি আর সহ্য করা হবে না।

ডোকলামে গত ৭ জুন থেকে ভারতীয় সেনা লালফৌজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। দিল্লিতে ভুটানের রাষ্ট্রদূত ভেটসপ নামগিয়েল বিবৃতি দিয়েছেন যে ডোকলাম (স্থানীয় ভাষায় ডোকা-লা) নিয়ে বিবাদ রয়েছে। ভুটান সরকারের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে লালফৌজের মদতে চীন রাস্তা নির্মাণ করেছে। এই এলাকা ভুটানের। এই রাস্তা নির্মাণের প্রতিবাদ করে বেজিংয়ের শাসকদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। চীন জবাব দেয়নি। বরং আরও আগ্রাসী মনোভাব নিয়েছে। আগস্ট মাসের শেষদিকে চীন-ভুটান সীমান্ত নিয়ে বৈঠক হতে পারে। আশা করা যায় যে সেই বৈঠকের পর চীন ভুটান থেকে তার সেনা সরাতে পারে। আশা করার কারণ সামরিক শক্তি বা যুদ্ধ করে সীমান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিশেষত এই একবিংশ শতকে। জার্মানিতে জি-২০ দেশগুলির বৈঠকের সময় চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিঙয়ের সঙ্গে মোদীজীর বৈঠক হয়। তারপরেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। চীনের দাবি, ভারত আগে একতরফা ভাবে ডোকলাম থেকে সেনা সরিয়ে নিলে তবেই লালফৌজ সরবে। তার আগে নয়। মামার বাড়ির আবদার! ভারতের বক্তব্য স্পষ্ট। আগে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মীমাংসা সূত্র বের হোক। তারপর সেনা সরাবার কথা হবে। বৈঠক হবে সমানে সমানে। চীনের দাদাগিরি ভারত সহ্য করবে না। ■

মমতা কমিশন বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ধামা’ রাজ্যের সেরা শিল্প

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ‘ধামা’ চেনে না। ‘ধামা’ নিয়ে বাংলা পরীক্ষায় রচনাও লিখতে হয় না। তাই ওই জিনিসটি ঠিক কেমন তা জানার দরকার হয় না। অথচ এই বাংলায় এখন ‘ধামা’ শিল্প সব থেকে বেশি জনপ্রিয়। না, একটু ভুল হয়ে গেল এর ওপরে আছে ‘শিলান্যাস’ শিল্প। তার পরে ‘ধামা’ শিল্প।

এবার জেনে নেওয়া যাক ‘ধামা’ শিল্প জিনিসটা ঠিক কী। ‘ধামা’ হলো এমন একটি পাত্র যা সব সময়ে চোখে দেখা যায় না কিন্তু যে-কোনো কিছুকে চাপা দেওয়া যায়। যেমন ধরা যাক কোথাও শিল্প হবে বলে জমি নেওয়া হলো। স্থানীয় বাসিন্দাদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। পরে বিষয়টিকে ধামা চাপা দিয়ে দেওয়া হলো। এই ভাবে রাজ্যের সর্বত্র যে কত ‘ধামা’ চাপা দেওয়া আগুন রয়েছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। বাদুড়িয়া-বসিরহাটের গোলমালও কিন্তু ‘ধামা’ চাপা আগুন। আবার একটি ‘ধামা’ কিনলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ধামার ওপরে ধামা, তার ওপরে ধামা দিলেও আগুন নেভানো যায় না। বরং আগুন বাড়ার দাহ্য পদার্থে তৈরি ধামা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারাও নিশ্চয়ই ভাল নেই। সত্যিই রাজ্যের পরিস্থিতি একেবারেই ভাল নয়। অনেক দাঙ্গায় আমাদের ঘর পুড়েছে, অনেক দাঙ্গা আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছে, ভাইয়ের প্রাণ নিয়েছে। তাই কে আর দাঙ্গা চায়। কিন্তু একবার যেখানে আগুন জ্বলেছে সেখানে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা কি আগুন বাড়তে দেওয়া নয়? প্রশ্নটা রইল আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

মমতা দিদি যখনই কোনো সমস্যা মেটাতে পারেন না কিংবা মেটাতে চান না তখনই তদন্ত কমিশনের নামে ধামা তৈরি করে ফেলেন। এই যেমন বাদুড়িয়া-বসিরহাটে গোলমাল নিয়ে তদন্তে তৈরি করেছেন বিচার বিভাগীয় কমিশন। কিন্তু এই কমিশনের ফল কী হবে? কিছুই হবে না। কারণ, গত ছ’বছরে মমতা দিদির ঘোষণায় কমিশন হয়েছে অন্তত ১০টি। কিন্তু নিট ফল শূন্য!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছ’ বছরের শাসনে গোটা দশেক বিচার বিভাগীয় কমিশন তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দু’টি কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়েছে। কিন্তু সেই রিপোর্ট দিনের আলো দেখেনি। বসিরহাটে অশান্তির পিছনে কাদের মদত ছিল, তা খুঁজতেই বিচার বিভাগীয় কমিশন গড়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কার্যকাল বেঁধে দিয়ে জানানো হয়েছে, প্রথম শুনানির দিন থেকে ছ’ মাসের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট দিতে হবে। কমিশনের মাথায় আছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সৌমিত্র পাল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কবে থেকে শুনানি শুরু হবে? এখনও কমিশনের অফিস ঠিক হয়নি। কমিশনের অফিস তৈরি, কর্মী নিয়োগ থেকে আরও কাজকর্ম মেটাতে মেটাতে কচ্ছপের গতিতে চলা রাজ্য প্রশাসন বছর খানেক সময় তো নেবেই। ততদিনে আরও কত বসিরহাট-বাদুড়িয়া হয়ে যাবে কে জানে!

২ জুলাই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট থেকে উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া, বসিরহাট, দেগঙ্গা ও স্বরূপনগর থানা এলাকায়। কয়েকটি জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কিছু ‘ভিত্তিহীন’ খবর প্রচারের জেরে সেখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে সরকারের মনে হয়েছে, এর পিছনে গভীর পরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের উৎস কী, সেটাই খুঁজে বার করবে কমিশন।

২০১১ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পরেই কয়েকটি ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে বিচার বিভাগীয় কমিশন তৈরি করেছিল মমতা প্রশাসন। তার মধ্যে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ২১ জুলাইয়ের গুলিচালনা, বরাহনগর-কাশীপুর গুলিচালনা, রাজারহাটের জমি বিলি, বিডিও কল্লোল শূরের অপমৃত্যু, আনন্দমার্গী হত্যাকাণ্ডও রয়েছে। পরবর্তী সময়ে মগরাহাটে গুলিচালনা, তেহট্টের গুলিচালনা, সারদা কেলেঙ্কারি নিয়েও গড়া হয়েছে বিচার বিভাগীয় কমিশন। তৈরির ছ’ মাসের মধ্যে বিধানসভায় রিপোর্ট পেশ করার কথা প্রতিটি বিভাগীয় কমিশনেরই। কিন্তু বেশিরভাগ কমিশন তৈরির পরে পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। অথচ কল্লোল শূরের মৃত্যু এবং ২১ জুলাইয়ের গুলি চালনার ঘটনা ছাড়া অন্য কোনও কমিশনেরই রিপোর্ট জমা পড়েনি। এবং ওই দু’টি ঘটনার রিপোর্ট জমা পড়লেও তা পেশ হয়নি বিধানসভায়। কয়েকটি কমিশনের কাজকর্ম গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে রাজ্য সরকার।

সুতরাং, কমিশন নামক ধামা রাজ্যের বড় শিল্প। না, শিল্পী মমতার এক শৈল্পিক কায়দা।

—**সুন্দর মৌলিক**

মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তাই সন্দেহজনক

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বাদুড়িয়া-বসিরহাটের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছেন। কার এবং কাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? অবশ্যই তাঁর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন যে সরকারটি গত ছ' বছর ধরে এই রাজ্যটি পরিচালনা করছে— তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এইরকম 'ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র' কে করছে। কে আবার? অবশ্যই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং সঙ্ঘ পরিবার। আকাশে মেঘ করলেও মুখ্যমন্ত্রী সঙ্ঘ পরিবারের ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছুই হয়নি। ফলে ঘটনার দিন পাঁচেকের মাথাতেই মুখ্যমন্ত্রী ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে— মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেও কেমন যেন একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এবং গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। ধান ভানতে শিবের গীত বেশি না গেয়ে বরং মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা এবং আচরণ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বসিরহাট-বাদুড়িয়ার ঘটনায় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী উদ্বিগ্ন হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়েছেন। অভিযোগ করেছেন, রাজ্যপাল তাঁকে অপমান করেছেন। এমন অপমানিত তিনি হয়েছিলেন যে পদত্যাগ করবেন বলেও ভেবেছিলেন— জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় উত্তেজিত হয়ে তাঁর ডাঁয়া-বাঁয়ারা দু-চার কথা শুনিয়ে দিয়েছে তাঁকে। অবশ্য রাজভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল 'অপমানজনক' কিছুই বলেননি। বর্তমান রাজ্যপাল একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী। দীর্ঘসময় তিনি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজ্যপালের কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন— একথা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের লোকেরা না মানলেও; অন্য সবাই মানে। বসিরহাট এবং বাদুড়িয়ায় হিন্দুদের ওপর মুসলমান জেহাদিদের হামলা নাগাড়ে তিনদিন চলার পরই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন করেছিলেন— একথা মনে রাখতে হবে। এই তিনদিন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ এবং প্রশাসন বাদুড়িয়ার অশান্তি থামাতে কোনো পদক্ষেপই করেনি। মুখ্যমন্ত্রীও দাঙ্গাবাজদের হুঁশিয়ার করে সামান্য বিবৃতিটুকুও দেননি। এইরকম পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না, থাকেনওনি। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে 'রাজধর্ম' পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয়ই মনে থাকা উচিত, নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পর তদানীন্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীও এমনই ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখন রাজ্যপালের সেই ভূমিকার সমর্থক ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। আর রাজ্যপালের ভূমিকার বিরোধিতা করেছিল তদানীন্তন শাসক সিপিএম। কথায় বলে ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর ভূমিকায় আজ কেশরীনাথ ত্রিপাঠী! কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি আমূল বদলে গিয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন জাগছে, রাজ্যপাল সতর্ক করার আগে যখন তিনদিন ধরে বাদুড়িয়া-বসিরহাটে জেহাদিরা তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছিল— তখন মুখ্যমন্ত্রী কী করছিলেন? কী করছিল তাঁর প্রশাসন? কেন হাত-পা গুটিয়ে নীরব দর্শকের মতো বসেছিল পুলিশ? এসব প্রশ্নের তো কোনো সদুত্তর নেই মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর প্রশাসনের কাছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রাজধর্মের কথা রাজ্যপালকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়— এটাই তো লজ্জার। অপমানিত হওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। নিজের এবং নিজের প্রশাসনের এই অপদার্থতা এবং ব্যর্থতা ঢাকতে রাজ্যপালকে আক্রমণের নিশানা করেছিলেন কিনা মুখ্যমন্ত্রী— সে প্রশ্নও তো সবার মনে জাগবে। বাদুড়িয়া-বসিরহাটের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনাদের অনেক প্রোটেকশন দিয়েছি। এখন আপনাদের জন্য আমাকে যা নয় তাই শুনতে হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে ইচ্ছে করছে, এই 'আপনারা' কারা? কাদেরই বা মুখ্যমন্ত্রী 'প্রোটেকশন' দিচ্ছিলেন? এই 'আপনাদের' কথা কেন খোলসা করে বলতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী? কোথায় তাঁর বাধা? অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী না বললেও, লোকে যা বোঝার বুঝে গেছে। এই 'আপনাদের' মন রাখতেই যে দুর্গাপূজার ভাসানের ওপর বিধিনিষেধ জারি হয়েছে, চারশো বছরের প্রাচীন রথযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পাঠ্য বইয়ের আরবিকরণ করা হয়েছে, ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতা চালু হয়েছে— তা মুখ্যমন্ত্রী না বললেও লোকে বোঝে। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন, রাজ্যপালের কাছে 'যা নয় তাই' শোনার আগেই মুখ্যমন্ত্রী এদের রাশ টেনে ধরলেন না কেন?

বাদুড়িয়া-বসিরহাটের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্ঘ পরিবারের ষড়যন্ত্র দেখতে পেয়েছেন। এমন নয় যে, এই মুখ্যমন্ত্রীর ছ' বছরের শাসনকালেই প্রথম এই বসিরহাট-বাদুড়িয়ায় হিন্দুরা আক্রান্ত হলো। গত ছ' বছরে এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বারেবারে ছোট-বড় নানা ঘটনায় হিন্দুদের ওপর মুসলমান জেহাদিদের আঘাত নেমে এসেছে। দেগঙ্গা, ক্যানিং, কালিয়াচক, ইলামবাজার, চন্দননগর, পুরুলিয়া, ধুলাগড়— একের পর এক এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানেন বোধহয়, এইসব ঘটনার কোনটিতে তাঁর দলের প্রাক্তন সংসদ সদস্য, কোনটিতে

বর্তমান সংসদ সদস্য, কোনটিতে বা তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য উস্কানিদাতার ভূমিকায় ছিলেন। এরা নিশ্চয়ই সঙ্ঘ পরিবারের সদস্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী এও নিশ্চয়ই জানেন যে, ২০০৭ সালে তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের যে ঘটনার ভিতর দিয়ে এই রাজ্য ইসলামিক জেহাদিদের আত্মপ্রকাশ, সেই ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেন তাঁরই দলের এক সংসদ সদস্য। মুখ্যমন্ত্রীর এও তো জানা উচিত— ইসলামিক মৌলবাদীদের পাশে বসে তিন তালাকের সমর্থনে খবর হয়েছিলেন তাঁরই দলের মন্ত্রী-সাংসদরা। ষড়যন্ত্রের গন্ধ খোঁজার আগে মুখ্যমন্ত্রী বরং একটু ভাবুন— আজ যে অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ পৌঁছেছে— তার দায় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দলের কতটা। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পুলিশ আছে। গোয়েন্দা আছে। মুখ্যমন্ত্রী তো একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ জেলার সীমান্ত অঞ্চলে গোরু পাচার এবং চোরাচালানের সঙ্গে তাঁর দলের কোন কোন স্থানীয় নেতা জড়িত। এও জানতে পারবেন হাওয়ালার মাধ্যমে তাদের কার কার কাছে বাংলাদেশের টাকা এসে পৌঁছচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্র সরকার বসিরহাট-বাদুড়িয়ার ঘটনায় ষড়যন্ত্র করছে। রাজ্য চাইলেও কেন্দ্র সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছে না। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব অবশ্য মিলছে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম দফায় চার কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী বসিরহাটে পাঠিয়েছে। পরের দফায় আরো চার কোম্পানি বাহিনী পাঠাতে চাইলেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসন তাতে রাজি হয়নি। কেন রাজি হলো না প্রশাসন? তার চেয়েও বড় কথা, প্রথম দফায় আধা সামরিক বাহিনী এসে পৌঁছলেও, তাদের প্রথমেই বসিরহাট যেতে দেয়নি প্রশাসন। বসিয়ে রাখা হয়েছিল বারাসাতে। কেন? এর কোনো সদুত্তর তো মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর প্রশাসন দিচ্ছেন না। কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে এও বলেছে, জঙ্গলমহল থেকে প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিরহাট পাঠানো হোক। সে জায়গায় জঙ্গলমহলে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসকে মোতায়েন করা হোক। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনের অবশ্য এতেও আপত্তি। প্রশাসন বলছে— জঙ্গলমহল থেকে আধা সামরিক বাহিনী তুলে নিলে মাওবাদী হামলা হতে পারে। আশ্চর্য! মাত্র কিছুদিন আগেই তো মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, জঙ্গলমহল হাসছে। জঙ্গলমহল যদি হেসেই থাকে— তাহলে সেখান থেকে আধা সামরিক বাহিনী তুলে বসিরহাটে পাঠাতে আপত্তি কোথায়? আসলে, ক্রোধে এবং উত্তেজনায় মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন না, তিনি কী বলছেন।

মুখ্যমন্ত্রী খড়্গহস্ত হয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর। খড়্গহস্ত হয়েছেন জাতীয় স্তরের কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের ওপর। খড়্গহস্ত হওয়ার কারণ, বসিরহাট-বাদুড়িয়ার ঘটনার এরা সত্যটিকেই প্রকাশ্যে এনেছে। কাউকে আড়াল করার অপচেষ্টা করেনি। মুখ্যমন্ত্রী ফতোয়া জারি করেছেন, সোশাল মিডিয়ায় বা প্রকাশ্যে যারা কোনো উত্তেজক মন্তব্য বা আচরণ করবে— তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ ও প্রশাসন। ইতিমধ্যেই হিন্দুত্ববাদী কতিপয় যুবককে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। এই যুবকরা যদি উত্তেজক কিছু মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়াতে করে থাকে এবং তার ফলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়— তাহলে অবশ্যই পুলিশ এবং প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি একটি প্রশ্ন আছে। যে মুসলিম যুবকরা দিনের পর দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত দিয়ে কুৎসিততম মন্তব্য করে যাচ্ছে, যারা প্রকাশ্য রাস্তায় গোমাংস ভক্ষণ করে হিন্দুর ধর্মীয় আবেগে আঘাত দিচ্ছে— তারা কি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াচ্ছে না? তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং প্রশাসন এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না কেন? কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনের এত দ্বিধা? এই আচরণ কি প্রমাণ করে না— এই প্রশাসন প্রকৃত অর্থেই হিন্দু বিদ্বেষী? মুখ্যমন্ত্রীর বোঝা উচিত— তালি কখনো এক হাতে বাজে না। দেশে সম্প্রীতি রক্ষা করার দায় শুধুমাত্র হিন্দুরাই বহন করবে— আর কারোর কোনো দায় নেই— তা কিন্তু হতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত দেওয়ালের লিখন পড়তে পারছেন না। বসিরহাট বাদুড়িয়ার ঘটনায় কিন্তু দেওয়ালের লিখন স্পষ্ট হয়েছে। ওই ঘটনার সময়ই মুখ্যমন্ত্রীর দলের এক সাংসদ তাঁর নির্বাচনী এলাকা থেকেই স্থানীয় মানুষদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছেন। ক্ষুব্ধ মানুষ তাঁর গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দলেরই এক বিধায়ক বসিরহাটে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যখন নিরাপরাধ যুবকদের ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন স্থানীয় মহিলারাই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এর বিরুদ্ধে। বিধায়ক জান এবং মান— দুই নিয়েই চম্পট দেন এলাকা থেকে। বিধায়কের বাড়ি ভাঙচুর করে স্থানীয় মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ক্ষোভটা কার বিরুদ্ধে। এবং ক্ষোভটা কতখানি জমাট বাঁধলে শাসক দলের সাংসদ-বিধায়কদের এলাকাছাড়া করতে পারেন সাধারণ মানুষ। আসলে ক্রমাগত অত্যাচারিত হতে থাকলে এক সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকেই যায়। তখন গড়ে ওঠে পালটা প্রতিরোধ। বসিরহাট-বাদুড়িয়া এই পাল্টা প্রতিরোধের চেহারাটি দেখেছে। মুখমন্ত্রী এর পরেও যদি দেওয়ালের লিখন পড়তে না পারেন, তাহলে বলতেই হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের হৃদয়ের শব্দ তিনি বোঝেন না। বুঝতে চান না। ■

বাদুড়িয়া-বসিরহাটের অশনি সঙ্কেত

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

এ কোন দেশ এ কোন বিচার

উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দির নিয়ে অশ্লীলবার্তা ছড়ালে জেলে পোরা হয় না, বাদুড়িয়ার হয়। শৌভিক সরকার সতেরো বছরের ছেলে। একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। মা নেই, বাবা দিনমজুর। জ্যেঠামশাই বাবলু সরকার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে চাকরি করেন। একতলা বাড়ি। ২ জুলাই বাড়িতে হামলা হয়। তখন সে পালিয়ে পাটক্ষেতে লুকিয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখলে এভাবেই লুকিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে! আজ স্বাধীন ভারতে এরকম করতে হচ্ছে শৌভিককে। মাগুরখালি গ্রামের মিশন মসজিদের সামনেই বাবলুবাবুর বাড়ি। মসজিদের ইমাম ইয়াসিন বলেছেন শৌভিক শান্তশিষ্ট ছেলে। স্থানীয় গ্রামবাসী নুর মহম্মদও বলেছেন, শৌভিক রাজনীতি করত না, করার কথাও নয়। স্থানীয় হাসপাতালে কাজ করেন মাগুরখালির আপন কুমার চৌধুরী। তিনি, তাঁর মা সুরিতা চৌধুরী শৌভিককে একইভাবে মুখচোরা ভালো ছেলে বলেছেন। বারাসাত আদালতে মহামান্য বিচারপতির এজলাশে শৌভিক বলেছে, 'এসব কিছুই করিনি।'

জানা যাচ্ছে ধর্ম নিয়ে স্কুলের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তর্ক হয় সেদিন। যারা শৌভিককে নানাভাবে তাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ— বোঝাতে চায় তাদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হওয়ার পরই এই 'মুখদর্শনী' (Face book post) ছড়িয়ে পড়ে। 'সানডে গার্ডিয়ান' তাদের অন্তর্জাল সংবাদে স্পষ্ট জানিয়েছে— এই পোস্ট শৌভিকের করা নয়। বলা হয়েছে— 'The Fb post created by an Muslim terrorist Organisation' —আর তা তৈরি হয়েছে— 'created outside India'. মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এই অবাঞ্ছিত ঘটনা নাকি দেশের হিন্দু-রাষ্ট্রবাদী শাসকদলের ষড়যন্ত্র। আর এতে বিদেশি চক্রান্ত আছে। অন্য রাষ্ট্রের লোকজন এসে গোলমাল লুঠপাট করে পালিয়েছে— তারা এল কীভাবে, সেটা দেখার কথা কেন্দ্র সরকারের! এ এক আশ্চর্য মানসিকতা। দেশ রক্ষার দায়িত্ব অবশ্যই সেনাবাহিনী, সীমান্ত রক্ষকদের; কিন্তু সীমানা পেরিয়ে ২৫



রাস্তাজুড়ে জেহাদিদের তাণ্ডবের চিহ্ন।

কিলোমিটার এলাকায় রাজ্য পুলিশের কোনো দায়িত্ব নেই? তাদের একমাত্র কাজ হলো ঘোষণা করা যে, শৌভিককে গ্রেপ্তার করা হবে। গ্রেপ্তারের পর বলে বেড়ানো যে, গ্রেপ্তার হয়েছে— এবার থামো সবাই।

সাধারণ অপরিকল্পিত তাৎক্ষণিক গোলমাল হলে তখনই মিটে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মেটেনি। শত শত মুসলমান আক্রমণ করে থানায়। দাবি শৌভিককে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। তারা শারিয়া বিধিতে পাথর ঠুকে খুন করবে এই কাফের মালাউনকে।

সপ্তাহখানেক হলো, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ইনটারনেট পরিষেবা বন্ধ। বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করতে পারছে না ছাত্র-ছাত্রীরা। বাদুড়িয়া ছোট গঞ্জশহর। ঘটনার পরদিন সেখানকার পুরসভার একজন তৃণমূল নেতার উপস্থিতিতে ফুটবল মাঠে প্রথম সভা হয় মুসলমান জনতার— দাবি ওঠে শৌভিককে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এই জনতা হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সটিতে আগুন লাগায়। বুঝতে অসুবিধা নেই সমস্ত ঘটনাই পূর্ব-পরিকল্পিত। আসলে হামলাকারীরা চেয়েছে— বাদুড়িয়া-মাগুরখালি-স্বরূপনগরে আক্রমণের পর চিকিৎসা করানোর সুযোগ যেন হিন্দুরা না পায়।

বাদুড়িয়া-বসিরহাটের হিন্দু সমাজের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু। তাদের উপর দ্বিতীয় বারের এই হামলা আসলে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম বাংলাদেশ গড়ার ভূমিকা ছাড়া কী? ২০১১-র জনগণনার পর বাদুড়িয়ায় ২৬ শতাংশ মানুষ মুসলমান। গত ৬ বছরে এই সংখ্যা উদ্বেগজনক ভাবে বেড়েছে। মুসলমানরা এই ঘটনার দ্বারা নিজেদের জানান দিয়ে গেল বলেই মনে হচ্ছে। সত্যি আমরা কোন দেশে বাস করছি! দেশটা কি হিন্দু বাঙালির পক্ষে আদৌ নিরাপদ? পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেরি নেই আর। বাদুড়িয়া-বসিরহাট তারই মহড়া দেখিয়ে গেল।

প্রশাসন মুসলমানদের তোয়াজ করে চলেছে

বাম আমলেই এই তোয়াজের সূচনা। দেগঙ্গার ঘটনা তখনকার। বিস্তৃত অঞ্চলে হিন্দু মন্দির ভাঙা, দুর্গাপুজোর স্থায়ী মণ্ডপে আসা যাওয়া বন্ধ করে কবরখানা বাড়িয়ে দেওয়া— প্রতিক্রিয়ায় আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলে ঘটপুজো করে প্রতিবাদ জানানো, হিন্দুদের প্রতিবাদের জবাবে মুসলমান দুর্বৃত্তদের ভয়ঙ্কর হামলা— বেছে বেছে হিন্দুদের দোকানপাট ভেঙে দেওয়ার ঘটনা গত জমানার। উস্তি ক্যানিং-তেহট্ট- ধুলাগড়-মল্লারপুর একের পর এক দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই আমলে। দাঙ্গা না বলে একে একতরফা হিন্দু বিরোধী ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই বলা যাবে না। মল্লারপুরে অভিজিৎ দত্ত মহরমের জন্য বিপুল চাঁদা দিতে না পারায় তাকে পিটিয়ে মারা

হয়েছে। কালিয়াচকের ঘটনা ভয়ঙ্কর। জালটাকা ভারত ব্যাপী ছড়িয়ে দেবার রীতিমতো কুটির শিল্প চলত এখানে। বাংলাদেশের চাঁপাই-নবাবগঞ্জ হলো এই কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। পাশাপাশি অবৈধ পোস্ত চাষ হয়ে উঠেছিল এখানকার একটি মুখ্য কারবার। পুলিশ সামান্য সক্রিয়তা দেখাতেই শুরু হলো ভয়াবহ উন্মাদনা। অন্য রাজ্যের কোনো ফেসবুক পোস্টকে অজুহাত করে সেখানেও চলল হিন্দুদের উপর হাঙ্গামা। আক্রমণ করা হলো থানা, জ্বলে গেল সমস্ত নথিপত্র। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ব্যাখ্যা এর লক্ষ্য ছিল পুলিশের নথিপত্র ধ্বংস করা। কারণ পুলিশের কাছে স্থানীয় অপরাধের ফাইলবন্দি তথ্য থাকলে তাদের বিপদ হতে পারত।

এবারের ঘটনার সঙ্গে উক্ত ঘটনাগুলির মিল হলো সরকার প্রথম দু-আড়াইদিন এই সংবাদ সম্পূর্ণ চেপে দেবার চেষ্টা করেছে। কালিয়াচক-মল্লারপুর-ধুলাগড় কোনো ঘটনার অস্তিত্বই তারা স্বীকার করেনি। সেসব অঞ্চলে বিরোধী দলের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এবারকার ঘটনা একটু আলাদা। রাজ্যপালের কাছে বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা গিয়ে বহু ঘটনার চিত্র ও বিবরণ তুলে ধরায় তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ খবর করেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই কথোপকথনের পর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক থেকে ৫ জুলাই রাত্রে তড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, তিনি নাকি অপমানিত হয়েছেন। পদত্যাগ করার কথাই ভেবেছিলেন। পরে ভেবেছেন, নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র সরকারের 'মনোনীত', বিজেপির 'ব্লক সভাপতি'র তুল্য রাজ্যপালের কথায় অভিমান করছেন না— মানুষ চাইলে চলে যাবেন। এ নিয়ে উত্তপ্ত কথাগুলি আর মুখ্যমন্ত্রীর চোখ মুখের ভাষা বাংলা তথা সারা দেশের মানুষ পড়েছেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান আর প্রশাসনিক প্রধানের এই দ্বৈরথ— না আমরা কোনোদিন দেখিনি। যুক্তফ্রন্ট আমলে রাজ্যপাল ধরমবীরকে 'গো-ব্যাক' বললেও বামপন্থীরা এমন অভব্যতা করেননি। নন্দীগ্রামের পুলিশি অত্যাচার বা গুলিবর্ষণের পর বামপন্থীরা সূর্যোদয় দেখলেও তদানীন্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী বলেছিলেন মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত বয়ে গেছে তাঁর। অনেকেই তখন রাজ্যপাল মহোদয়কে তৃণমূলপন্থী বলেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিছু বলেননি।

৫ জুলাইয়ের পর অনেকেই রাজ্যপালের বিপক্ষে ক্রমাগত বিষোদ্‌গার করে চলেছেন। 'আলু আর আলু বোখরা', বিজেপির তোতাপাখি— এইসব বলেছেন। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে রাজ্যপাল নীরব দর্শক থাকতে পারেন না। পবিত্র সংবিধানের ১৭৫ অনুচ্ছেদে আছে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল বিধানসভাকে (বা বিধানপরিষদ কিংবা উভয় সভাতে) শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত করাতে পারেন। ভাষাংশ উদ্ধার করছি : 'The Governor may send messages to the house or houses of the legislature of the state',... এই বার্তা নিশ্চয়ই বিধানসভাকে (এবং অথবা বিধানপরিষদ)-র মুখ্য মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাতে হবে। আর এও লেখা আছে যে এই বার্তা হতে পারে 'with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration'. মনে রাখতে হবে, সংবিধান যখন রচিত হয় তখন সংযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো দূরভাষ-চলভাষ, (মোবাইল) বা সচলভাষ (অ্যান্ড্রয়েড ফোন) নির্ভর ছিল না। অতএব রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোন করে উদ্বেগ জ্ঞাপন করে ভুল করেননি।

সীমান্ত অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকায় যখন আগুন জ্বলছে— মানুষ অসহায় তখন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান রাজনৈতিক অঙ্ক কষে তোষণ মূলক ব্যবস্থা নিলে সাংবিধানিক প্রধান কিছু বলবেন না— এ হতে পারে না।

৪ জুলাই বাদুড়িয়া মলয়াপুরে র‍্যাফ নামে। মুসলমান দুষ্কৃতীরা তাদের বেধড়ক পেটায়। তিনটি র‍্যাফের বাহন (ভ্যান) পুড়িয়ে ফেলে তারা। বসিরহাটের পুরাতন বাজারে 'সৎসঙ্গ মন্দির'টি ভেঙে ফেলে মুসলমান দুষ্কৃতীরা। টহল দেয় সমস্ত মহকুমা জুড়ে—মোটর বাইক বাহিনী। ময়লাখোলায় কালীমন্দির, সংগ্রামপুরে শিবমন্দির মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

৫ জুলাই বাদুড়িয়া রঘুনাথপুরের রথের মেলায় সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আক্রমণ করে বাইক বাহিনী। মুখে 'আল্লাহ্ আকবর', ত্রিমোহিনীর এই প্রাচীন রথের মেলা, রথের কারুকার্য সব ধ্বংস করতে করতে এগোয় তারা।

একই দিনে পোড়ানো হয় এসপি-র গাড়ি। সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। রাত ১২টা নাগাদ এক-দেড়শো মুসলমান বাদুড়িয়া থানায় হাজির হয়। গোলমাল করে। তাদের দাবি, শৌভিককে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

সমস্ত ঘটনায় রাজ্য সরকারের মুসলমান-তোষণ নীতির নির্লজ্জ পরিচয় মিলছে। ৪ জুলাই পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার বিরুদ্ধে কথা বলতে যান কিছু স্থানীয় নাগরিক। তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সঞ্জয় গোস্বামী, শ্রীমতী রাজশ্রী লাহিড়ী, সুরজ পোদ্দার আর সুরজিৎ বিশ্বাস। তখন পর্যন্ত একজন হামলাকারী মুসলমানও ধরা পড়েনি সম্ভবত। ঢুকতে দেওয়া হয় না বিজেপি নেত্রী দেবশ্রী রায়চৌধুরীকে। বারাসাত ডাকবাংলো মোড়ে তাঁকে বেশ কিছু সমর্থক সহ আটকে দেওয়া হয়েছে।

৬ জুলাই সাংবাদিকরা বিস্তৃত এলাকায় গাছের গুঁড়ি বা পিলার ফেলা রাস্তা, পুড়িয়ে দেওয়া পুলিশের ভ্যান দেখেছেন। বহু ধর্মস্থান (শুধুমাত্র হিন্দুদের) ভাঙার চিহ্ন চোখে পড়েছে তাদের। শববাহী গাড়ি আটকে মৃতদেহের উপর অত্যাচারের পাশবিকতা করতে দেখা গেছে। রুদ্রপুর, হাসনাবাদ, টাকি, বসিরহাট, খোলাপোতা সর্বত্র ছড়ায় হামলা।

এদিন পুলিশ আরও পনেরো জনকে গ্রেপ্তার করে। বলা বাহুল্য, তাদের অধিকাংশ হিন্দু। অর্থাৎ যারা আক্রমণ করল তারা রইল বাইরে যারা আক্রান্ত তারা পুলিশি ঝামেলা সহ্য করল। তিন কোম্পানি বিএসএফ আর এক কোম্পানি সি. আর পি এফ বিস্তৃত গণ্ডগোল প্রবণ অঞ্চলের পক্ষে অপ্রতুল মনে হলো।

এরপর সব বিরোধী দলের নেতা বাদুড়িয়া যেতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। এদের

অনেকেই জনপ্রতিনিধি। মীনাক্ষি লেখি, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অধীর চৌধুরী, সুজন চক্রবর্তী কাউকেই ঢুকতে না দেওয়ায় মনে সন্দেহ হয় সরকার কি কিছু আড়াল করতে চাইছে? বস্তুত তাই। এ পর্যন্ত ২৮ জন আহত হয়েছেন (১২ জন পুলিশ)— আহতদের প্রায় সবাই হিন্দু। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি হানি বা লুঠ হয়েছে। মারা গেছেন ৬৫ বছর বয়সের চায়ের দোকানি কার্তিক ঘোষ। বসিরহাট ট্যাটরায় তিনি চায়ের দোকান চালাতেন।

অনুপ্রবেশ, খারিজা মাদ্রাসা না বিদেশি চক্রান্ত?

মুখ্যমন্ত্রী মমতা থেকে অনেকেই একথা বলছেন। চক্রান্তের স্পষ্ট প্রমাণ কিছু আছে। অনুমানও করা চলে।

১. ৫ জুলাই ঘটনাস্থলে 'অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জমিয়ত'-এর সভাপতি আবদুল মতিনকে বাদুড়িয়া মাগুরখালি অঞ্চলে দেখা গেছে।

২. স্থানীয় বিধায়ক হাজি নুরুল, সাংসদ ইদ্রিস আলি আর নাখোদা মসজিদের ইমাম সফিক কাশেমি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইদ্রিস আলির বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে! তিনি নাকি শান্তি ফেরাতে গিয়েছিলেন। আমরা ভুলিনি এই নেতার উস্কানিতেই বাম আমলে তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে জেহাদি মুসলমানরা পার্কসার্কাসে জমায়েত হয়েছিল।

৩. ৫ জুলাই হাড়োয়া রোড স্টেশনে হাজির হন 'সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন'-এর সম্পাদক-সহ কিছু কর্মকর্তা। কেন? স্পষ্ট উত্তর কে দেবে।

৪. খাঁপাড়ার কিছু মহিলা আমিনা, ফজিলা, রওশনরা বিবি হঠাৎ বলেন, আমরা '৭০ বছর একসঙ্গে আছি'। একেবারে হিসাব করা উত্তর। বলা বাহুল্য এদের কারো বয়স ৭০ কিনা জানা যায়নি। কেন তারা সত্তর বছরই বললেন? স্বাধীনতা যে সত্তর বছর আর মিলেমিশে থাকার শুরু যে তখন থেকে! কোনো সন্দেহ নেই এরা অধিকাংশ ইছামতী পেরিয়ে এসেছেন।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব নাকি দলে মুসলমানদের বাড়বাড়ন্ত, তোষণের চূড়ান্ত, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর জামাত থেকে রাতারাতি মন্ত্রী হওয়ার ঘটনা, টিপুসুলতানের শাহি ইমামের বিচিত্র তোষণ আর শাহেনশার মতো ব্যবহার অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। গোরু-সোনা বে-আইনি অস্ত্র পাচারকারিরাই নাকি এ ঘটনার জন্য দায়ী। রুদ্রপুর অঞ্চলে ভাঙচুর ঘটিয়েছে যারা, তারা সবাই হিন্দিতে কথা বলছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। ইছামতীর তীরে এত হিন্দি (বা উর্দু) ভাষী মানুষ এল কোথা থেকে? আসলে বসিরহাট মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চলে বেআইনি খারিজা মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে এরকম খারিজা মাদ্রাসায় জঙ্গিদের শিক্ষাদানের সংবাদ উঠে এসেছিল। বাম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ নিয়ে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেই ঢোক গিলে কথা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বস্তুত শাসন গোলাবাড়ি, খড়িবাড়ি, আমিনপুর, দেগঙ্গা জীবনপুর, বেড়াচাপা প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর বাংলাদেশি আর অন্য প্রদেশ থেকে আসা ছাত্র পড়াশোনা করে। তারাই পূর্বনির্ধারিত মতলবে খোলাপোতা, জোড়া অশ্বত্থতলা, কাজির বাড়ি, মলয়াপুর, হাড়োয়া, ভাসিলা, সান্তাশিয়া অঞ্চলে ৩ জুলাই থেকে দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের ভিতরের গোলযোগের প্রমাণ পাই ৬ জুলাই। পুলিশ সঙ্গে নিয়ে অত্যাচারিত হিন্দু যুবকদের সন্ধান আর গ্রেপ্তার করতে গিয়ে সদ্য বার্সেলোনা ফেরত ফুটবলারনেতা দীপেন্দু বিশ্বাসকে ময়লাখোলা গোডাউন পাড়ার মহিলারা ঝাঁটা উঁচিয়ে তাড়া করার মধ্যে। বসিরহাট দক্ষিণে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরানো হয়েছে— এসেছেন অমিত মজুমদার। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ কিছু নেতা দলত্যাগ করেছেন। বহু তৃণমূল-কর্মী মুসলমান আক্রমণের প্রতিরোধ করতে নেমেছেন, এমন কথাও জানা গেছে।

সব থেকে অবাক করা সংবাদটি এসেছে সাতক্ষীরার সাংসদ মোস্তাফা লুতফুল্লাহ-র কাছ থেকে। ২০১২-তে সাতক্ষীরায় জামাত মিছিলে হাসিনার পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হলে কয়েকজন মারা যায়। আহত জামাতিরা স্থানীয় তৃণমূল সাংসদের সহায়তায় ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা পায়। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, বাংলাদেশে চিকিৎসা করালেই পুলিশ ধরবে। এর পরে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে বসিরহাট বহুদিন ধরেই বাংলাদেশি জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে। সেই থেকে এইসব দুষ্কৃতী ইছামতীর এপার ওপারে প্রতিপত্তি বাড়িয়ে চলছে। লুতফুল্লাহের মতে একই ভাবে বাংলাদেশেও অনুরূপ হামলা হয়েছে। ফেসবুক পোস্ট ছড়িয়ে হিন্দুদের নিকেশ করার চেষ্টা হয়েছে নাশিরনগর, রামু, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায়। সম্প্রতি ধরা পড়েছে মাহফুজ, খাগড়াগড় বিস্ফোরণ থেকে ঢাকার হোলি আর্টিজান বেকারির হামলার সঙ্গে মাহফুজের সংযোগ সুবিদিত।

পুলিশ যাদের ধরেছে তাদের মধ্যে চারজন বাংলাদেশি। আরও অনেককে ধরলে পুলিশ ঘিরে মেরে ধরে তাদের নিয়ে পালিয়েছে গুণ্ডারা। ধৃত চারজনই বাংলাদেশি জমায়েত আর হুজির সঙ্গে যুক্ত। মীনাক্ষি লেখি অভিযোগ করেছেন, সমস্ত ঘটনার পিছনে আছে সাহেন সা নামে এক ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতী। ধরাপড়া মহম্মদ মোশারফ হোসেন খান (৩৫) বাংলাদেশি, তার কাছে বাংলাদেশ আর ভারতের পাশপোর্ট পাওয়া গেছে! বাংলাদেশে শেখ হুমায়ুন নামে একটি পাশপোর্ট আর মহম্মদ হুমায়ুন হিসেবে একটি ভারতের পাশপোর্টধারী ব্যক্তির ধরাপড়া থেকেও একই সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে।

১০ জুলাই বাগুণ্ডি গ্রামে চারটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আবার আরও বাংলাদেশি জঙ্গি আসার খবর রটেছে। বিরোধী কণ্ঠস্বর বন্ধ করার জন্য খবর গোপন করা, নথি লোপাট করার জন্য সরকার অদ্ভুত তৎপরতা দেখাচ্ছে। নাহলে বিপদগুলির গভীরতা বুঝতে পারতেন তারা। হিন্দু সংখ্যাগুরু খুলনা জেলার মানুষ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার উৎসব পালন করেছিলেন। সাতদিন পর মুর্শিদাবাদ জেলার পরিবর্তে খুলনা পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই খুলনার পশ্চিমাংশ সাতক্ষীরা এখন জামাত-হুজির মুক্তাঞ্চল। 'বিচারপতি সৌমিত্র পাল তদন্ত কমিশন' ঘোষিত হয়েছে। আশা করা যায় সত্য উদ্ভাসিত হবে। আসল সত্য জানা যাবে অনাগত ভবিষ্যতে।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

রোহিঙ্গাদের দিয়ে জম্মু দখলের ছক জঙ্গিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মুতে রোহিঙ্গা মুসলমান সমস্যা এবার সত্যিই বড়ো মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে চলেছে। জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা জারি রয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী রাজ্যের বাইরের কেউ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। কিন্তু কিছুদিন থেকে এক সরকারি পরিসংখ্যানে জানা যাচ্ছে যে জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানদের সংখ্যা ১৩ হাজার ৪০০। প্রকৃত সংখ্যাটা যে আরও বেশি হবে তা বলা বাহুল্য। ১৯৮২ সালে তাদের দেশের সংসদে মায়ানমার সরকার এক আইন পাস করে রোহিঙ্গাদের বসতি স্থাপন করে। কিন্তু জম্মুতে ৩৭০ ধারা উপেক্ষা করে তাদের পাকাবাড়ি তোলার এই প্রবণতা সাম্প্রতিক। আর এতে কপালে ভাঁজ পড়েছে দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মহলের।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য কাশ্মীর এমনিতেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। তার ওপর রোহিঙ্গাদের স্থায়ী বাসস্থান গড়ে উঠলে হিন্দুদের ওপর মারাত্মক চাপ তৈরি হবে। তাঁদের মতে অবিলম্বে এই প্রবণতা বন্ধ না হলে জম্মু-কাশ্মীরে রোহিঙ্গা ও অন্যান্য উদ্বাস্তু সমস্যা দেশের নিরাপত্তার সামনেই বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেবে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছে এবং এর সঙ্গে রোহিঙ্গাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলে ওই রাজ্যের পুলিশ সূত্রের খবর। বিশেষ করে ড্রাগ পাচার ও রাহাজানি রোহিঙ্গা যুবকদের পেশা হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়।ইদানীং পাক- মৌলবাদীদের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ বাড়ছে। আবদুল কুদুস বার্মি ও অন্যান্য কয়েকজন রোহিঙ্গা মিলে তাদের একটি জঙ্গি সংগঠন 'হুজি আরাকান' গড়ে তুলেছে। এই হুজি আরাকানের নেতারা কিছুদিন আগে করাচিতে হাফিজ সইদের মতো জঙ্গিদের সঙ্গে এক মঞ্চে ছিল। ভারত বিরোধী চক্রান্তে হুজি আরাকানের যোগসাজশের বিষয়েও গোয়েন্দাদের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে বলে সূত্রের দাবি।



রোহিঙ্গাদের হাতে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এমনকী স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে বেআইনি পথে। কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কয়েকজন আমলা এর সঙ্গে জড়িত বলে গোয়েন্দারা সন্দেহ করছেন। এরই মধ্যে সন্দেহের তালিকায় চলে এসেছে জঙ্গি মদত ও অর্থপুষ্ট কয়েকটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম। এরা রোহিঙ্গা ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসা শিক্ষার নামে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে অভিযোগ। পরিকল্পনা মাফিক রোহিঙ্গারা ঘাঁটি গেড়েছেন জম্মুর তাওয়ি নদীর দু'পাশের পার্বত্য ও বন্য এলাকা জুড়ে। ভাতিণ্ডি, নরওয়াল নাগরোটা, বেলিচারানা-র মতো এলাকাগুলিতে রোহিঙ্গাদের বসবাসের কারণে এলাকার জনবিন্যাসের চিত্রটাই পুরো পাল্টে গিয়েছে।

ভাতিন্ডি অঞ্চলকে মিনি পাকিস্তান বানানোর চক্রান্ত চলছে। এখানকার বনাঞ্চলে রোহিঙ্গারা তাদের বসতি স্থাপন করেছে। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা বনের দুর্গমতার সুযোগ নিয়ে আসলে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবির চালানো হচ্ছে। সাধারণ ভাবে জম্মুতে আসার কোনও কারণ রোহিঙ্গাদের দিক দিয়ে নেই, ভৌগোলিক কিংবা অর্থনৈতিক কোনওভাবেই জম্মু রোহিঙ্গাদের উপযুক্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আসছে একটাই লক্ষ্য নিয়ে— শান্ত জম্মুকে অশান্ত করা। জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জম্মুকেও পাক-অধিগ্রহণের দাবির দিকে ঠেলে দিয়ে ভারতবর্ষকে নিরপত্তার দিক দিয়ে বিপন্ন করাই এখন জঙ্গিদের লক্ষ্য বলে গোয়েন্দাদের অভিমত।

অরুণাচলে স্মার্ট ক্লাসরুম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অরুণাচল প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গতি আনার জন্য স্মার্ট ক্লাসরুম প্রকল্প চালু করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খানডু আধুনিক শিক্ষা যোজনার অন্তর্গত এই প্রকল্পটি সম্প্রতি উদ্বোধন করেছেন। আপাতত বিভিন্ন সরকারি স্কুলে প্রকল্পের কাজ হবে। উল্লেখ্য, স্মার্ট ক্লাসরুম প্রকল্পে কম্পিউটার-নির্ভর কে-ইয়ান (নলেজ ইয়ান) শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খানডু এই নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে অরুণাচলের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যাশিত গতি আনা সম্ভব হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন। তিনি জানান, স্মার্ট ক্লাসরুম উদ্যোগটি রাজ্যের শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর এবং ইডিসিআইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের একটি মিলিত প্রয়াস। শেষোক্ত সংস্থাটি কেন্দ্রের পরিচালনাধীন। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৭১৩টি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুলে চালু করা হবে স্মার্ট ক্লাসরুম। এর মধ্যে রয়েছে ১০০টি উচ্চ মাধ্যমিক, ১৮২টি মাধ্যমিক, ১৭৮টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ২৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইতিমধ্যে ২১ জন প্রশিক্ষক এবং ১,০৯৭ জন শিক্ষককে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ইলেকট্রনিক টিচিং ডিভাইসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়তো শিক্ষকদের একটু সময় লাগবে। কিছু অসুবিধেও হতে পারে। কিন্তু যখন তারা বুঝবেন ক্লাসরুমে প্রযুক্তির প্রয়োগ রাজ্যের শিক্ষায় যুগান্তর এনে দিতে পারে তখন তারা ধীরে ধীরে সব সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন।' ইডিসিআইএল এবং রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর যেভাবে কিন্ডারগার্টেন থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী কে-ইয়ান ডিভাইসটি তৈরি করেছে মুখ্যমন্ত্রী তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

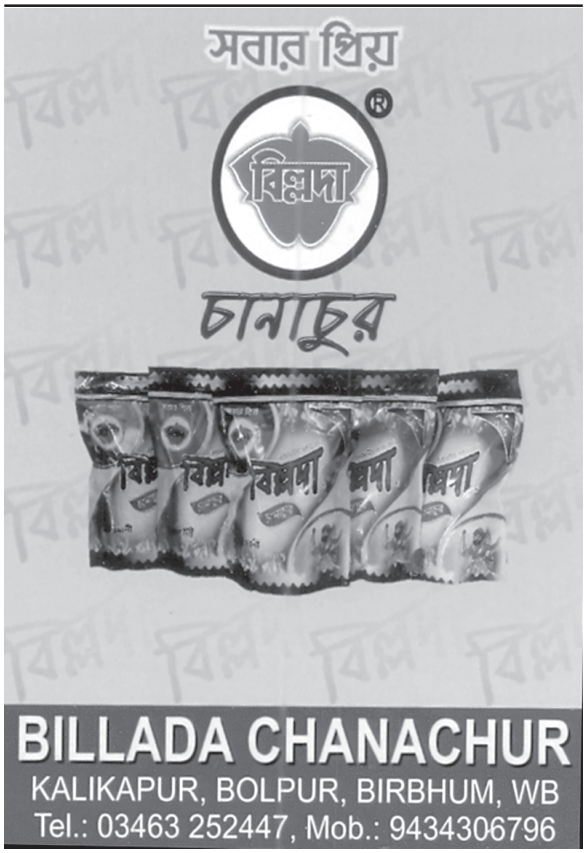

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

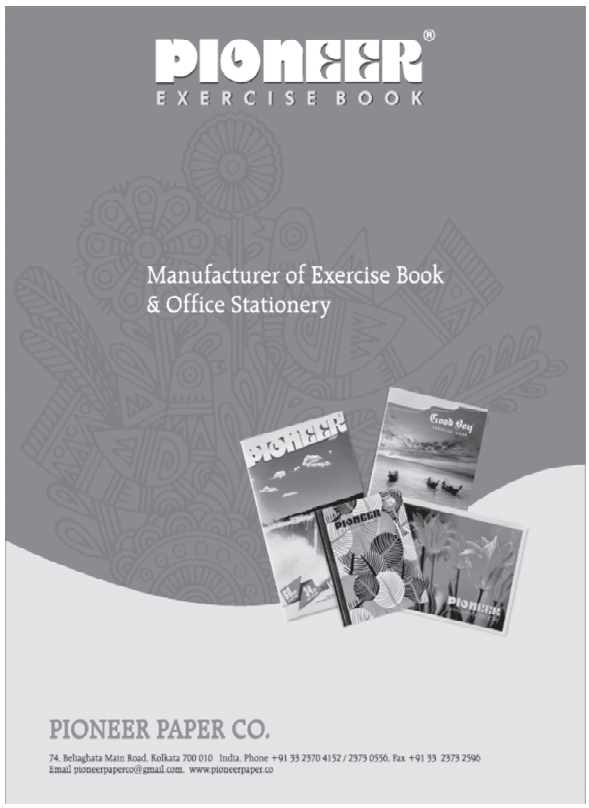

ভারত-চীন সংঘাত কি অনিবার্য?

ধর্মানন্দ দেব

এশিয়া মহাদেশের সবচাইতে বৃহৎ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন এবং ভারত। প্রায় ভারতের গায়ে লাগিয়ে অবস্থান করছে চীন। উভয় দেশের মধ্যে রয়েছে শুধু তিব্বত। ইতিহাস বলছে ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব বহু পুরনো। ১৯৬২ সালের পূর্বে কোনো ভারতবাসী ভাবতেই পারেননি এই চীন একদিন ভারতের সীমান্ত-শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। কেননা চীন-জাপানের যুদ্ধের সময় চীন দেশের আহত হওয়া সৈনিকদের নিঃস্বার্থভাবে চিকিৎসা করেন একজন ভারতীয় চিকিৎসক। নাম ছিল দ্বারকানাথ কোটনিছ। কিন্তু চীন দেশে বামপন্থী চিন্তা-ধারার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এবং চীন দেশ তিব্বত অধিগ্রহণের মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে ভারত-পাক সীমান্তে সন্ত্রাসে এবং কূটনৈতিকভাবে চীন পাকিস্তানকে অনবরত মদত প্রদান শুরু করে। ভারতের একতা ও অখণ্ডতা বিপন্ন করার জন্য চীন এক ঘৃণ্য খেলায় সর্বদা মত্ত হতে থাকে। আর আজ এটাই যেন চীনের এক অঘোষিত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সড়কপথে প্রতিবেশী পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে আকাশপথে কাবুলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সম্প্রতি ভারত- আফগানিস্তানের যৌথ উদ্যোগে নতুন এয়ার করিডোর উদ্বোধন হয়। কিন্তু চীন ভারতের এই উদ্যোগকে পর্যন্ত ভাল চোখে দেখেনি। গত ২৬ জুন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'গ্লোবাল টাইমস'-এ সমালোচনা করে বলা হয়— 'একগুঁয়ে ভূ-রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফসল'। উরি হামলার পর চীন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে, তেমনি ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তানে এক ঐতিহাসিক 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' করে এবং ১৯৫৬ সালের সিন্ধু নদীর জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে ভারত এক সমীক্ষা বৈঠকে বসে ও বৈঠক শেষে ভারত জানায় দেশের সীমান্তে উগ্রবাদী কার্যকলাপ পাকিস্তান বন্ধ না করলে সিন্ধুনদীর জল বন্ধ করে দেবে। ভারতের ওই হুঁশিয়ারির কয়েকদিন পরেই চীন ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদীর 'জিয়াবুকু' উপনদীর জল বন্ধ করে দেয় এবং বাঁধ তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়। চীনের ওই প্রকল্পটির নাম হচ্ছে 'লালহো'। কারণ চীন চায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেন জল নিয়ে এক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। তাই চীন ইতিমধ্যে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহে আরো তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন করেছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি অসম এবং অরুণাচল প্রদেশ সংলগ্ন স্থানে নির্মাণ করা হয় ভূপেন হাজারিকা সেতু এবং উদ্ঘাটন শেষ হওয়ার পর চীন নতুন দিল্লিকে সতর্ক করে বলে যে অরুণাচলে কোনো যোজনা বা প্রকল্প রূপায়ণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য। কিন্তু ভারত দমে যাওয়ার পাত্র নয়, তাই অরুণাচলের চিয়াং জেলার অন্য একটি নদী বাঁধের প্রকল্প ঘোষণা করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক কাশ্মীরের জয়েশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করার জন্য ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘে আবেদন জানায়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য পদ থাকা ১৫টি দেশের মধ্যে ১৪টি দেশই ভারতের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতকে সমর্থন জানায়। কিন্তু চীনই একমাত্র ভারতের বিরোধিতা করে।



চীনা দ্রব্যের অবাধ কারবার।

ভারতের এনএসজি সদস্যপদের তীব্র বিরোধিতা করেছে চীন। আর যার ফলস্বরূপ আজও ভারত এনএসজি গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করতে পারেনি। অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি করে চীন পাকিস্তানে ৩ কোটি ১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। পাকিস্তান চীনকে প্রায় দু' হাজার একর জমি প্রদান করে। আরব দরিয়ায় বন্দর তৈরি করে ভারতকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টায় রয়েছে চীন। ভারতের আরেক প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশকেও চীন প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করেছে। চীন এখন পাকিস্তান-বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ভারতকে কোণঠাসা করতে চাইছে।

চীন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে বেশি

বাণিজ্য করে ভারতে। আমরা যদি শুধু ভারতের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে চীন ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৭১.৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। তার মধ্যে চীন ভারতে বাণিজ্য করে ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার এবং ভারত চীন দেশে বাণিজ্য করে মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার। টাকার অঙ্কে যদি আমরা এই ঘাটতির পরিমাণ দেখি তখন দেখা যাবে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, শুধু মোবাইল এবং ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে ভারতে চীন বাণিজ্য করেছে প্রায় ১৯.৮ বিলিয়ন ডলারের এবং মেশিনারি দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে চীন ভারতে বাণিজ্য করেছে ১০.৬ বিলিয়ন ডলারের। ভারতের বাজারে বাজাজ, অজন্তা, উইপ্রো, এভারেডি ইত্যাদি প্রায় ২৫টির মতো এলইডি বাল্ব নির্মাতা কোম্পানি দেশে থাকা সত্ত্বেও বিগত অর্থ বৎসরে কেন্দ্রের বিদ্যুৎ মন্ত্রক প্রায় দুই কোটি এলইডি বাল্ব চীন থেকে ক্রয় করে। ফলে দেশের অর্থ ব্যবস্থা ক্রমশ তলানিতে যাচ্ছে। ভাবলে অবাক লাগে আমাদের ঘরের ঠাকুর দেবতার মূর্তিও এখন চীনে তৈরি হয়ে আসছে। দীপাবলীর আলোকসজ্জা, বাজি- পটকা, আবির থেকে শুরু করে ঘুড়ি পর্যন্ত চীনে তৈরি হয়ে ভারতের বাজারে দিব্যি বিক্রি হচ্ছে। চীনা দ্রব্যে যেন ছেয়ে যাচ্ছে সমগ্র ভারতের বাজার। সম্প্রতি ভারত সরকার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে এবং দেশের আমজনতাকে ক্যাশলেস লেনদেন অধিক পরিমাণে করার আহ্বান জানায়। ওই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের একাংশ মানুষ ক্যাশলেস লেনদেন করেন। কিন্তু এই ক্যাশলেসের জন্য ভারতের সবচাইতে বড় দুই ওয়ালেট যথাক্রমে পেটিএম এবং স্ন্যাপডিলের মালিকানা চীনের ওনলাইন রিটেইল কোম্পানি আলিবাবার অধীনে। তাই ক্যাশলেস লেনদেনের সংখ্যাও যত ভারতে বাড়ছে তত চীনা ওয়ালেট কোম্পানির রমরমা ব্যবসাও বাড়ছে। তিন বছর ধরে কেন্দ্র সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান চলছে। কিন্তু চীনের সঙ্গে ভারত পাল্লা দিতে পারছে কই? ভারতের বাজারে চীনের দাপট দিনের পর দিন বাড়তে থাকায় ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি শিল্প-কারখানা আজ প্রায় সব বন্ধ হওয়ার পথে। আর বেকারের সংখ্যা দেশে হু-হু করে বাড়ছে। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে যুব প্রজন্মের সংখ্যা অধিক। প্রতি বছর ভারতে শুধুমাত্র ঔদ্যোগিক ক্ষেত্রে প্রায় ১.১৫ কোটি কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয় আর এমন একটি দেশে ক্রমশ শিল্প, কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে বেকারত্ব ঘোচাবে কী করে। কেমন করে দেশের আর্থিক বিকাশ হবে। জাপান ও আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও বাণিজ্য ক্ষেত্রে চীন ভারতের শীর্ষাসনে বসে রয়েছে। বলাবাহুল্য চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যে শুধু তলানিতে তা নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে চীন আজ হুমকি স্বরূপ। পাকিস্তান এবং উত্তর-কোরিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশের সঙ্গেই চীনের সম্পর্ক তেমন বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। চিরকালই বন্দুকে বিশ্বাসী চীনের ছলের কোনো অভাব থাকে না। পণ্ডিত নেহরু-র 'পঞ্চশীলের' দফারফা করে চীন ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে। নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে লালফৌজ। সম্প্রতি চীন সীমান্ত পেরিয়ে সিকিমে ঢুকে পড়ে ভারত-ভুটান-তিব্বতের সীমান্তে ডোকা লা অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে। উভয় দেশের সেনার মধ্যে হাতাহাতির পর আর এগোতে পারেনি চীনা সৈন্য। শুধু সীমা লঙ্ঘন নয়, গত ১৯ জুন তিব্বতের মধ্যে দিয়ে ৪৭ জন ভারতীয় তীর্থযাত্রী কৈলাস মানসরোবর যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু চীন অনুমতি দেয়নি। উল্লেখ্য ২০১৫ সাল পর্যন্ত কৈলাস মানস সরোবর যাওয়ার একমাত্র রাস্তা ছিল নেপাল সীমান্তে উত্তরাখণ্ডের ভিতর দিয়ে। অর্থাৎ 'লিপু পাস' দিয়ে যেতে হয়। এই রুট অত্যন্ত দুর্গম এবং সময়সাপেক্ষ। পরে উভয় দেশের বার্তালাপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় সিকিমের নাথুলা পাস দিয়ে যাওয়া যাবে। কেননা বাস চলাচলের পক্ষে এই রুট সুবিধাজনক। কিন্তু চীন এখন নাথুলা পাস দিয়ে তীর্থযাত্রী যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ভারতের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে বর্তমান অবস্থান এখন আর সেই ৬১ সালের নয়। এখন ভারত অনেক জাগ্রত। বিশেষ করে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত আজ এক শক্ত অবস্থানে রয়েছে। তাইতো সম্প্রতি ভারতের সেনাধ্যক্ষ বিপিন রাওয়াত ঘোষণা করেছেন যে যুদ্ধসদৃশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আমাদের দেশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আজ থেকে প্রায় চার বছর পূর্বে ভারতীয় স্থল সেনাধ্যক্ষ জেনেরেল ভি কে সিংহ আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বিশ্বের কোনো একটি দেশের সঙ্গে একমাস যুদ্ধের জন্য ভারতের রসদের অভাব রয়েছে। এই তুলনামূলক বয়ান থেকেই ভারতের বর্তমান শক্তি পরিলক্ষিত হয়।

শুধু এখন প্রয়োজন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে চীনের আগ্রাসন থেকে ভারতের বাজারকে রক্ষা করা। প্রথমেই তার জন্য প্রয়োজন দেশের পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করা। আর এঁরা জাগ্রত হওয়ার পর দেশব্যাপী শুরু করতে হবে 'ট্রেইড ওয়ার' বা 'ওয়ার অব ইকনমিক্স'। ওই যুদ্ধের পাঁচ শ্রেণী যথাক্রমে— (১) সরকার, (২) নীতি নিদর্শক সংস্থা, (৩) শিল্পপতি, (৪) গবেষক এবং (৫) সাধারণ জনসাধারণ বা উপভোক্তা। দেশের আর্থিক বিকাশ ঘটাতে হলে ওই যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। চীনা দ্রব্য সামগ্রী বর্জন না করা হলে চীন আমাদের বাজার দখল করে স্বদেশি দ্রব্য সামগ্রী বা স্বভিমানের বিলুপ্তি একদিন ঘটাবেই। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশের সীমা শুল্ক খুব বেশি পরিমাণে থাকায় দেশব্যাপী বিদেশি দ্রব্যের তেমন প্রচলন ছিল না। কিন্তু যখন থেকে ভারত 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার' সদস্যপদ লাভ করে তখন থেকেই দেশে সীমা শুল্ক কমে যায়। যার ফলে সমগ্র দেশের বাজারে বিদেশি দ্রবের রমরমা ব্যবসা গড়ে উঠে, বিশেষ করে চীনা দ্রব্য-সামগ্রীর। আর চীন তাদের দেশে সেভাবে ঢুকতে দিচ্ছে না ভারতকে। তাইতো ভারতে স্বাধীনতার সময় ১ টাকা প্রায় ১ ডলারের সমান ছিল। কিন্তু আজ সেই ১ ডলার প্রায় ৬৫ টাকার সমান। তার জন্য মূলত দায়ী ভারতের বাজারে বিদেশি দ্রব্য-সামগ্রীর বাড়বাড়ন্ত। আমাদের দেশের ১৩০ কোটি দেশভক্ত জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চীনের তৈরি দ্রব্য বর্জন করে চীনের বৈরীসুলভ মনোভাবের সময়োচিত জবাব দিতে হবে। এখন থেকে স্বদেশ মন্ত্রই হোক আমাদের প্রধান শক্তি। নতুবা দেশে চীনা আগ্রাসন বন্ধ হবে না এবং সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে।

(নিবন্ধকার পেশায় আইনজীবী)

ডোকলাম সঙ্কটের মূলে রয়েছে চীনের দাদাগিরি



এখানেই ছিল রয়াল ভুটান আর্মির বাঙ্কার।

সোহম মিত্র

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ডোকলাম মালভূমি অঞ্চলটি ছিল ভুটানি পশুপালকদের চারণভূমি। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ ভারত এবং চীনের মধ্যে বহুবার সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু কেউই ডোকলাম নিয়ে মাথা ঘামায়নি। মাথা ঘামানো শুরু হলো ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধের পর। চীন যেন হঠাৎ করে বুঝতে পারল ডোকলাম নিছক মালভূমি হলেও, এই অঞ্চল ভারত চীন এবং ভুটানের সঙ্গমস্থলও। যার সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম।

তারপর থেকে যতবার কথা হয়েছে ততবারই চীন ডোকলাম নিয়ে ভুটানের বৈধ দাবি খারিজ করে দিয়েছে। বেজিং মনে করে চীনের চুম্বি ভ্যালির নিরাপত্তার জন্য ডোকলাম গুরুত্বপূর্ণ। এবং সে গুরুত্ব বিশেষভাবে সামরিক। কতকটা সেই কারণেই কামান, হালকা ট্যাঙ্ক এবং ভারী গাড়ি (মিলিটারি ট্রাক) নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং নিজেদের সামরিক উপস্থিতি আরও বাড়াবার জন্য চীন ওই অঞ্চলে অত্যাধুনিক রাস্তাঘাট নির্মাণে নজর দিয়েছে। ডোকলামের গুরুত্ব আরও একটা কারণে চীনের কাছে বেশি। এই মালভূমি ভারতের একেবারে দোরগোড়ায়। এখান থেকে শিলিগুড়ি করিডোর বা বহুখ্যাত চিকেন নেকের দূরত্ব মাত্র ২৭ কিলোমিটার। তার থেকেও বড়ো কথা সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চল এই চিকেনস নেকের মাধ্যমে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

৮ জুন রাতে চীনা সামরিক বাহিনী ডোকলামে সক্রিয় হতে শুরু করে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সীমান্তে ভারতও সেনাসংখ্যা বাড়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের বাহিনী কখনও এরকম মুখোমুখি হয়নি। অশান্তির উপলক্ষ দুটি বাঙ্কার। রয়াল ভুটান আর্মি বহুবছর আগে বাঙ্কারদুটি তৈরি করেছিল। চীনের সেনাবাহিনী ওগুলো ভেঙে দেয়। এর ফলে ডোকলামের এতদিনের স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়।

মজার ব্যাপার হলো, এর ঠিক পরের দিন কাজাখাস্তানের আস্তানায় সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনের সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিঙ্ একটি সাক্ষাৎকারে মিলিত হলেন। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা টেনশনের কারণগুলি আলোচিত হলো। আগের মাসেই চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড সামিট বয়কট করেছিল ভারত। কারণ ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গেছে এবং ভারত এই নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়ে এসেছে। জুনের আরও একটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় চীন আরও একবার এন এস জি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি তোলে। এর ঠিক পরেই ফ্রান্স-ব্রিটেন-আমেরিকা মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা হবে কিনা তাই নিয়ে নতুন করে টালবাহানা শুরু করে।

এত কিছুর পরেও জি জিন পিঙ্ এবং মোদীর সাক্ষাৎকার ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। যে কারণে সাক্ষাৎকারের পর বিদেশসচিব এস জয়শঙ্কর বলেন, 'দুই দেশের মতপার্থক্যের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। মতপার্থক্য থেকে যাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় দুই নেতা তা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' অথচ এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই চীন ডোকলাম সীমান্তে সেনা মোতায়েন

করা শুরু করল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জি জিন পিঙ্ এর আগেও নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে দুই নেতা একগুচ্ছ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। মনে হয়েছিল বরফ বোধহয় এবার গলবে। অথচ এই কূটনৈতিক বোঝাপড়াকে অগ্রাহ্য করে চীন লাদাখের কাছে চুমারে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন করল। জি জিন পিঙ্ বললেন, সেনা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন। এই প্রতিশ্রুতির যে কোনো দাম নেই তার প্রমাণ ডোকলামের ঘটনা।

এখন প্রশ্ন হলো ডোকলামে যা ঘটল তার স্বপক্ষে চীনের যুক্তিটা ঠিক কী? চীন বলছে ভারত-চীন-ভুটানের ত্রিদেশীয় সঙ্গমের কেন্দ্র হলো মাউন্ট গিপমোচি (গেমো চেন)। এই অঞ্চল ভারত-ভুটানের সংযোগ রেখা (বাটাং লা-র কাছে) থেকে কিছুটা দক্ষিণে। মধ্যবর্তী ৮৯ স্কোয়ার কিমি জমি চীন দাবি করছে। আবার ভারত এবং ভুটানের মতে এখানেই রয়েছে তিনটি দেশের সঙ্গমস্থল। অবশ্যই সমস্যা শুধুমাত্র ডোকলামের সাইজ নিয়ে নয়। যে চারটি জায়গা নিয়ে চীন আর ভুটানের দীর্ঘকালের স্নায়ুযুদ্ধ, ডোকলাম তার মধ্যে অন্যতম। চব্বিশবার দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে কিন্তু কোনও মীমাংসাসূত্র পাওয়া যায়নি।

ডোকলামের সামরিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে চীনে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং দিল্লির ইনস্টিটিউট অব চাইনিজ স্টাডিজের ডিরেক্টর অশোক কান্থা বলেন, 'এই অঞ্চলে চীনের রাস্তাঘাট তৈরির ফলে ভারত ও ভুটানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেছে।' তিনি আরও বলেন, 'চীন এখানকার স্থিতাবস্থায় বড়োসড়ো আঘাত করেছে এবং এর ফলে ভারতের বিপদ বাড়তে পারে। চীনারা ডোকলামের ত্রিদেশীয় সংযোগস্থলটিকে নিজেদের দখলে রাখতে চাইছে। এই অঞ্চলে চীনা বাহিনীর উপস্থিতিও আমাদের একটা মাথাব্যথার কারণ।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ৫০ বছর আগেও একবার ভারত-চীন সীমান্তে এই ধরনের সঙ্কট দেখা গিয়েছিল। সেবার ইন্দিরা গান্ধীর সরকার চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছিল। সমস্যার উদ্ভব কয়েকজন পশুপালককে তাড়াবার নামে চীনা বাহিনীর ভারতীয় সীমান্তের কাছে চলে আসাকে কেন্দ্র করে। সেবারও চীন ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। তবে তা এবারের মতো কখনওই ছিল না। ১৯৮৮ সালে দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবার পর ডোকলামের ঘটনাতেই চীন ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম এমন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখাল। চীনের মতে তার একটা কারণ ভুটানের ডোকালায় বাহিনী পাঠিয়ে ভারত সিকিম-তিব্বত সীমা অতিক্রম করে চীনের সীমানায় অনধিকার প্রবেশ করেছে।

এই প্রসঙ্গে চীনের বিদেশসচিব বলেন, 'ভারত-চীন সীমান্তে অন্তর্জাতিক আইনে নির্দিষ্ট সিকিম বিভাগের সীমা সঙ্ঘন করেছে ভারতীয় বাহিনী। সেই কারণেই এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো ঘটনার তুলনা চলে না।' চীনের বিদেশমন্ত্রকের মাপকাঠিটি হলো ১৮৯০ সালের সিকিম-টিবেট কনভেনশন। চীনা কর্তৃপক্ষের দাবি চীন এবং স্বাধীনতা-উত্তর একাধিক ভারতীয় সরকার এই কনভেনশনকে মান্যতা দিয়েছে। অর্থাৎ সিকিম বিভাগের সীমা কনভেনশন এবং দুই দেশের ঐক্যমত্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট।

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা অবশ্য চীনের



দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি, কনভেনশনের নথিতে চোখ বোলালেই বোঝা যাবে ব্রিটিশরা সীমান্তসমস্যা আলোচনা করার জন্য চীনে যায়নি, গিয়েছিল ব্যবসা করতে। সেই সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতা করা ছাড়া চীনের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে চীন এই কনভেনশন-বিরোধী কাজ করে গেছে। উদ্দেশ্য, ভারত এবং ভুটানের নানা অংশ দাবি করে নিজের সীমানা বাড়িয়ে নেওয়া। বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিকদের মতে, কোনো কোনো ভারতীয় সরকার সিকিম-টিবেট কনভেনশনকে ভারত ও চীনের সীমান্তসমস্যার রফাসূত্র বলে মেনে নিলেও, বর্তমান সরকার তা মানছে না। কারণ এরকম কোনো সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। যে কারণে ভারত কোনও বর্ডার পোস্টও তৈরি করেনি। চীন নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের সীমা অবৈধ উপায়ে বদলে দেবার চেষ্টা করছে। আরও একটা বিষয় চীন ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছে, তা হলো, ১৮৯০ সালের সিকিম-টিবেট চুক্তিতে ভুটান সই করেনি। সুতরাং তাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত করার কোনও অধিকার চীনের থাকতে পারে না। ডোকলামের অধিকার ভুটানের হাতে ছেড়ে দিয়ে চীনের উচিত মানে মানে সরে পড়া।

দাবির স্বপক্ষে অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে চীন দাখিল করতে চাইছে ১৯৫৯ সালে বৌ এন লাইকে লেখা জওহরলাল নেহরুর একটি চিঠি। যে চিঠিতে নেহরু ১৮৯০ সালের কনভেনশন মেনে নিয়েছিলেন বলে চীনের দাবি। ভারতীয় আধিকারিকদের যুক্তি, 'ওরা দশ পাতার চিঠি থেকে পছন্দমতো দু-একটা লাইন তুলে বাজার গরম করতে চাইছে। এটা দেখছে না ওই চিঠিতেই বলা হয়েছে আকসাই চীন ভারতের



ডোকলামে চীনের তৈরি রাস্তা।

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ম্যাকমোহন লাইন হলো তার সীমানা।' প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত অশোক কান্থা বলেন, 'সিকিম সেক্টর নিয়ে ভারত এবং চীন একটা ঐকমত্যে পৌঁছেছে। তবে দুই দেশই জানে আরও আলোচনার প্রয়োজন। যাবতীয় সমস্যার উৎস যে ত্রিদেশীয় সঙ্গমস্থল তাও দুই দেশ জানে।'

চীনের আর একটি দাবি, ভুটান নাকি ডোকলাম চীনের অংশ বলে মেনে নিয়েছে। এমনকী সেখানে চীন যা করছে তাতেও ভুটানের কোনও আপত্তি নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে চীন ভুটানকে একটি বিবৃতি দিতে বাধ্য করেছে। যেখানে বলা হয়েছে, কয়েক দশক ধরে চীন এবং ভুটানের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে। ১৯৮৮ এবং ৯৮-তে দুটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, 'দুই দেশ সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখবে এবং সামরিক শক্তি ব্যবহার করা-সহ এমন কিছুই করবে না যা এই অঞ্চলের স্থিতাবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে।' যে কারণে ডোকলামে চীনের রাস্তা তৈরি ভুটানের কাছে 'বিশ্বাসভঙ্গ এবং কথার খেলাপ'। চীনের অভিযোগ ভুটান সরকারের সম্মতি ছাড়াই ভারত এই ব্যাপারে নাক গলিয়েছে। ভারতীয় আধিকারিকেরা জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধানে ভুটানের পাশে থেকেছে। ১৯৬৬ সালে চীন ডোকলামে সেনা পাঠিয়েছিল। ভুটান বেজিঙের সঙ্গে বসে সমস্যাটি মিটিয়ে দেবার জন্য ভারতকে অনুরোধ করেছিল। এক আধিকারিক বলেন, 'চীন ক্রমাগত একটা মিথ্যেকে লালনপালন করে চলেছে। যাতে সেটা একদিন ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়।'

একথা অনস্বীকার্য চীনের এই দ্বিচারিতা এবং ক্রমবর্ধমান দাদাগিরিতে ভারতের উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষ করে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চীন যেভাবে স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে তাতে ভারত এবং ভুটান দুই দেশই উদ্বিগ্ন। চীনের এহেন কার্যকলাপ দক্ষিণ চীন সমুদ্রেও দেখা গেছে। অনেকেই জানেন সেখানে উডি দ্বীপে চীন কীভাবে একটি নগর তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য অবশ্যই সামরিক। ২০১৩ সালে চীন দেপস্যাঙ্ সমতলে একটি ছাউনি তৈরি করেছিল। তিন সপ্তাহ ধরে হাজার হাজার চীনা সৈন্য সেখানে মোতায়েন ছিল।

ভারতের আর একটি মাথাব্যথার কারণ তিব্বত। চীন সেখানে বিশাল-বিশাল হাইওয়ে তৈরি করেছে যা নাথু লা পেরিয়ে একেবারে ডোকলাম পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। লাসা থেকে ইয়াদং, প্রায় ৭০০ কিলোমিটার রাস্তা এখন আট ঘণ্টার কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। অথচ গ্যাংটক থেকে ডোকলাম, মাত্র ৫০ কিমি রাস্তা অতিক্রম করতে এর দ্বিগুণ সময় লাগে। ডোকলাম সমস্যার ভারে ভারত ও চীনের জটিলতম আরও কয়েকটি সীমান্ত সমস্যা এখন প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। পশ্চিম সীমান্তে চীন ভারতের ৩৮০০০ স্কোয়ার কিলোমিটার অঞ্চল জবরদখল করে রেখেছে যা আকসাই চীন নামে পরিচিত। পূর্বে চীনের দাবি গোটা অরুণাচল প্রদেশ (৯০,০০০ স্কোয়ার কিমি)। স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হলেও চীন তার দাবি থেকে বিন্দুমাত্র সরেনি। আকসাই চীন নিজের দখলে তো রেখেইছে, সেই সঙ্গে অরুণাচলের তাওয়াং নিয়েও মাঝে মাঝে হুমকি দেয়।

অন্য কোনও দেশ চোখে চোখ রেখে কথা বললে চীনের হীনতা কতদূর যেতে পারে তার প্রমাণ, ডোকলাম-বিতর্কের অব্যবহিত পরেই নাথু লা পাশ দিয়ে কৈলাস ও মানস সরোবরে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদী এবং জি জিন পিঙ্‌য়ের উদ্যোগে কৈলাস ও মানস সরোবরে যাত্রা চালু হয়েছিল। চীনের ধারণা কৈলাস ও মানস সরোবরে তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিতে পারলে ভারতীয় হিন্দুরা ভয়ানক রুষ্ট হবেন এবং নরেন্দ্র মোদীকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটা জানে না, চীনকে উচিত শিক্ষা দেওয়াটা ভারতীয়দের কাছে আরও বড়ো ব্যাপার। তার জন্য একবছর তীর্থযাত্রা না করতে পারলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

সমাজতন্ত্রের পথ চীন আগেই ছেড়েছে। এখন চীন পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক এবং সেই সুবাদে সাম্রাজ্যবাদীও। বাইবেল যেমন বলে, যে তোমার সঙ্গে নেই সে তোমার শত্রু। পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। কমিউনিজমও এতকাল এই শিক্ষা দিয়েছে। যার প্রমাণ রাশিয়া দিয়েছে, চীনও দিচ্ছে। অথচ ভারতের নবীন রাজনীতিবিদ রাহুল গান্ধী গোপনে চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেকথা ফাঁস হয়ে গেলে বেমালুম বলে দেন, কই যাইনি তো! এদের বিন্দুমাত্র ইতিহাসচেতনা নেই। এরা জানেই না যে চীনের অস্ত্র আছে কিন্তু শস্ত্রশিক্ষা নেই। কোথায় থামতে হয় চীনের জানা নেই। সুতরাং চীনকে থামাতে না পারলে ভারতের সমূহ বিপদ। এই সামান্য কথাটা দলমত নির্বিশেষে ভারতের মানুষ যেদিন বুঝবেন সেদিন শুরু হবে আসল লড়াই। ■

এই সময়

অ-পুলিশি

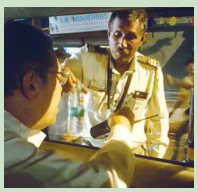

হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক পণ্ডিত ওষুধ খাবেন বলে রাস্তার রংসাইডে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। সঙ্গে জল ছিল না। সহকারীকে পাঠিয়েছিলেন জল আনতে। এই সময় এক পুলিশ অফিসারের আবির্ভাব। সব শুনে তিনিই এনে দিলেন জল। হৃদয়বান এই অফিসারের নাম সমর হরিকৃষ্ণ দেবনাথ।

ঈশ্বরপ্রেরিত

সেদিন পানামা সিটি সমুদ্রসৈকতে অসম্ভব ভিড়। তারই মধ্যে এক বিশাল ঢেউয়ের



ধাক্কায় তলিয়ে যাচ্ছিলেন একটি পরিবারের ছয় সদস্য। দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন জেসিকা সিমন্স। আরও প্রায় ৮০ জন সহমর্মী মানুষের সাহায্যে গড়ে তুললেন মানবশৃঙ্খল। বেঁচে গেল পরিবারটি।

কুয়োয় সিংহ

বয়েস মোটে দু' বছর। খেলতে খেলতে কখন যেন আশি ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে গিয়েছিল



সে। গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বনকর্মীদের খবর দেয়। কুয়ো থেকে তুলে সিংহের শাবকটিকে বনে ছেড়ে দেন তাঁরা। গির অঞ্চলের ঘটনা।

সমাবেশ -সমাচার

মহাজাতি সদনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সন্ত সম্মেলন

''দেশ বিভাগের আগে ১৯৪৬ সালে তৎকালীন বাংলার শাসক সুরাবর্দির প্রত্যক্ষ মদতে অখণ্ড বাংলায় যেভাবে হিন্দুদের ওপর একতরফা আক্রমণ করে হিন্দু নিধন শুরু হয়েছিল, আজ স্বাধীন দেশে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের ছত্রছায়ায় একই ভাবে হিন্দুদের ওপর জেহাদি হামলা শুরু হয়েছে। আর আশ্চর্যজনক ভাবে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সংবাদমাধ্যম প্রকৃত তথ্য তুলে না ধরে এর জন্য হিন্দুদেরই দোষারোপ করে চলেছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সাধুসন্তদের নেতৃত্বে হিন্দু সমাজকে উঠে দাঁড়াতে



হবে।'' গত ১৩ জুলাই মহাজাতি সদনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শকমণ্ডলীর উদ্যোগে সন্ত সম্মেলনে একথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। সম্মেলনে আগত সাধুসন্তদের কাছে ড. বসু আবেদন জানান তাঁরা যেন রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তাঁদের শিষ্য ও ভক্তদের সচেতন করেন। পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আয়োজিত সন্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আলমবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ, রিষড়া প্রেম মন্দিরের স্বামী নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের স্বামী তিতিক্ষানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ মহারাজ, স্বামী পরমাত্মানন্দ অবধূত প্রমুখ বিভিন্ন মত-পন্থ ও মঠের সাধু সন্ন্যাসী। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা নন্দলাল লোহিয়া, বসন্তরথ, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ। এদিন মহাজাতি সদনে সাধু-সন্ত ও নাগরিকদের উপস্থিতিতে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়— (ক) দেশ, জাতি, সমাজ ও ধর্ম রক্ষায় হিন্দুদের সংগঠিত করা, (খ) হিন্দুদের শ্রদ্ধার কেন্দ্র মঠ-মন্দিরের পরিচালন সমিতিতে কোনো অহিন্দুকে রাখা চলবে না, (গ) ১৯৫০ সালের আইন অনুযায়ী গোহত্যা বন্ধ করতে হবে এবং সীমান্ত এলাকায় গো-হাট রাখা চলবে না। উপস্থিত সাধু-সন্ত ও নাগরিকরা এই তিনটি প্রস্তাব ওঙ্কারধ্বনি দিয়ে সমর্থন করেন। এরপর সাধু-সন্তরা এই বিপদের সময়ে হিন্দুদের করণীয় বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ ব্যক্ত করেন। ক্ষেত্র সংগঠক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আগামী পরিকল্পনার বিষয়ে সবাইকে অবহিত করান। সম্মেলন সুচারুরূপে পরিচালনা করেন পূজ্য বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।

এই সময়

সেলফির বিপদ

জুড জেসপার শখ করে বান্ধবীর সঙ্গে সেলফি তুলেছিলেন। কিন্তু ছবিটা উঠল অন্যরকম।

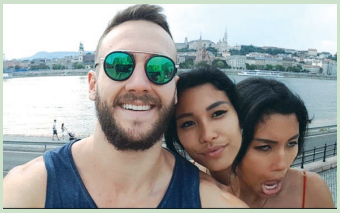

দেখে মনে হতে পারে জুডের বান্ধবীর দুটি মাথা। ওয়াইড সেলফি লেন্সের সামনে নড়াচড়া করা বারণ। নিষেধ না মানায় এই বিপত্তি।

সাপের গ্রাসে

বব হাওয়ার্ড আমেরিকার লোয়া অঞ্চলের রাথবান লেকে মাছ ধরছিলেন। বড়শিতে

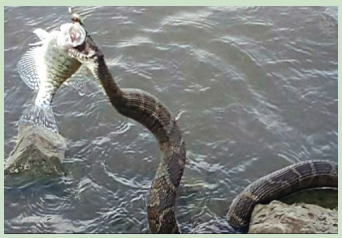

গাঁথা মাছ তোলার সময় জলের তলা থেকে একটা বিশাল সাপ লাফিয়ে উঠে সেই মাছ নিয়ে পালিয়ে যায়। লেকের জলে সাপ কোথা থেকে এল জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দু' কোটির রান্নাঘর



এ আই ডি এম কে নেত্রী শশীকলার পছন্দের রান্নাঘর বানাতে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল জেল কর্তৃপক্ষের দু' কোটি টাকা খরচ হয়েছে। নেত্রী এখন সেই রান্নাঘরে তৈরি খাবার খেয়ে বহালতবিয়তে আছেন। বিপুল দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেত্রীর কাণ্ডে সকলেই হতবাক।

সমাবেশ -সমাচার

কোচবিহারে সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ

উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে দশদিবসীয় সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপ্তি হয় গত ২৬ জুন কোচবিহারের সারদানগর বিদ্যাভারতী বিদ্যালয় পরিসরে। গত ১৫ জুন প্রশিক্ষণ বর্গের উদ্বোধন করেন বিদ্যা ভারতীর অখিল ভারতীয় সংস্কৃত প্রমুখ বিজয় গণেশ কুলকার্ণী। বর্গে ১০২ জন সংস্কৃত শিক্ষক শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষাদান করেন উত্তরবঙ্গ



সংস্কৃতভারতীর সংগঠন সম্পাদক কমল শর্মা, মালদার জয় সাহা এবং কর্ণাটক থেকে আগত উমা মহেশ্বর। সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দিনেশ কামত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী বর্গ পরিদর্শন করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বহু সংস্কৃতপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার ২নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপক চক্রবর্তী।

দুর্গাপুরে সেবা বিভাগের কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা



গত ২ জুলাই দুর্গাপুর সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ইছাপুর সেবাভবনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের মায়েদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৩৫ জনের 'মা' উপস্থিত ছিলেন। মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া বিদ্যুৎ হালদার এবং উচ্চ মাধ্যমিকে মহকুমার মধ্যে প্রথম হওয়া সুমিত্রা নাগ (৯৫ শতাংশ)। এবং ছাত্র-ছাত্রীর মায়েদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সরকার ও একটি বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী কাকলী চ্যাটার্জী সকলের গলায় পদক পরিয়ে হাতে শংসাপত্র তুলে দেন।

এই সময়

নজরে চীন

ভারত এখন এমন এক ক্ষেপণাস্ত্রের পরিকল্পনায় ব্যস্ত যা চীনের যে-কোনো



জায়গায় আঘাত হানতে সক্ষম। খবরটি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার পত্রিকায়। লিখেছেন দুই বিখ্যাত সমর বিশেষজ্ঞ এম. ক্রিস্টেনসেন এবং রবার্ট এস জরিস।

পাশে ভারত

আই এস জঙ্গিদের সঙ্গে ফিলিপিনসের যুদ্ধের বয়েস সাত সপ্তাহ হয়ে গেল। ফিলিপিনসের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ভারত যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য তিন কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান বরাদ্দ



করেছে। সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

মুদ্রাস্ফীতিতে পতন

১৮ বছর পর মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড ১.৫৪ শতাংশ কমল। শাকসবজির দাম কমে যাওয়াই এর কারণ বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলের দাম সামান্য বাড়লেও



তার প্রভাব মুদ্রাস্ফীতিতে পড়েনি। মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মানিয়ম একে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন।

সমাবেশ -সমাচার

শ্রীগুরু পূর্ণিমায় সিউড়ি সংস্কার ভারতীর শিল্পী সংবর্ধনা

গত ৯ জুলাই গুরু পূর্ণিমা তিথিকে শিল্পী সম্মাননা দিবস হিসেবে উদযাপন করল সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখা। সেদিন সিউড়ি শিক্ষকভবনে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নটরাজ বন্দনা করেন সংস্থার সদস্যরা। সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতায় সাংস্কৃতিক অর্ঘ্য নিবেদিত হয়। গত ১১ বছর ধরে এই দিনটিতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাঁরা নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হয়। এবছর নাট্যকর্মী, রূপসজ্জাবিদ



সনৎ গোস্বামীকে সংবর্ধনা জানালো সংস্কার ভারতী। শিল্পীর হাতে মানপত্র, পুষ্পস্তবক, ফল, মিষ্টান্ন তুলে দেন সংস্থার সভানেত্রী লোক সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে নটরাজ প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি নিবেদিতা চক্রবর্তী। সম্মাননার পর শিল্পী সনৎ গোস্বামী বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নাট্য জগতের সঙ্গে যুক্ত। নিজে বহু অভিনয় করেছি। বহু নাটক যাত্রাপালায় রূপসজ্জার কাজ করেছি। তবে সংস্কার ভারতীর ওই সম্মান আমার কাছে এক পরমপ্রাপ্তি।

শিল্পী সনৎ গোস্বামী স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি একাধিক বিখ্যাত নাটক ও যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন। মহেঞ্জোদড়ো, নাচমহলের মতো একাধিক বিখ্যাত যাত্রাপালায় স্বনামের সঙ্গে অভিনয় করেন সনৎবাবু। তিনি শুধু সিউড়ি শহর বা বীরভূমেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন নাট্যদলের কর্মীদের রূপসজ্জার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। গুরু পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে এহেন শিল্পগুরুকে সম্মাননা জানানোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের বহু বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকর্মী।

সীমা জন কল্যাণ সমিতির প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১৮ জুন সীমা জন কল্যাণ সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলার কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সমাজের কল্যাণের এবং শক্তির জন্য নারী শক্তির প্রয়োজনের উপর জোর দেন। শিবিরে ৭২ জন অংশগ্রহণ করেন। মহিলা ছিলেন ১৫ জন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কল্যাণ কুমার দাস, জেলা সভাপতি তাপস বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক বঙ্কিম কর্মকার। শিবির পরিচালনা করেন দক্ষিণবঙ্গের সীমা জন কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি সন্তোষ কুমার সরকার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও তিনি বক্তব্য রাখেন।

স্বাধীনতার ৭০ বছর পর ভারত এক বাজারসূত্রে আবদ্ধ

অতিথি কলম



জয় পণ্ডা

আমরা প্রায়ই মোটমুটি ভাল কোনো জিনিসকে চট করে নিতে চাই না। যুক্তি— এটা তো নিখুঁত নয়! সদ্য আইনে পরিণত হওয়া জি এস টি'র ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা একেবারে মাপে মাপে মিলে যায়।

ইতিমধ্যে সকলেই দেখেছেন যে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালীন এটিকে লাগু করার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিল তারাই আজ আদাজল খেয়ে এর নিন্দায় মশগুল। ঠিক তেমনই আজকের শাসন ক্ষমতায় থাকা দলগুলিও বিরোধী ভূমিকা পালনের সময় এই কর সংস্কারের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আজকের বিরোধী দলগুলি যারা কদিন আগেও বিলটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জন, পরিবর্তনে শুধু সহমতই হয়নি, দেশের সংসদে এটিকে ভোট দিয়ে অনুমোদন দিয়েছিল, তাঁরাই আবার নতুন করে বিরোধিতায় নেমেছে। বিলের এই ঘষা মাজা প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রক্রিয়া সমাধা হতে আড়াই বছর লেগেছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদে পেশ হওয়া থেকে ৩০ জুন ও ১ জুলাইয়ের সন্ধিক্ষণের মধ্য রাত্রে আইনি জন্ম নেওয়ার আগের মুহূর্তেও বিলে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী কর শতাংশ সংশোধন করা হয়েছিল। সত্যি বলতে বাজপেয়ী জমানার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর ভাবনায় সূচিত হওয়া থেকে ধরলে বিলটির লাগু হতে লাগল সেই আঠারো মাস (আঠারো মাসে বছর যাকে বলে)। তাই প্রায় দু' দশক ব্যাপী এই যাত্রা পথে নানা সময়ে নানান কুশীলব এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা রেখে গেছেন। সেটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ক্ষেত্রেই হোক বা বিলটির নানান সম্ভাব্যতার প্রতিক্রিয়া নিয়েই হোক। ভারতবর্ষের অপ্রত্যক্ষ (Indirect) কর ব্যবস্থায় এত বড় পরিবর্তন আনা বড় সহজ কাজ ছিল না। আজ অতীতের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর মহানুভবতা ও দূরদর্শিতার কথা বলতেই হয় কেননা তিনি বিলটির রূপরেখা তৈরি করতে যে কমিটি তৈরি করেছিলেন তার মাথায় বসিয়েছিলেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি (এমআইটি) থেকে পিএইচডি করা তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অসীম দাশগুপ্তকে। দলের কেউ না থাকলেও মধ্যরাত্রির সন্ধিলগ্নে অসীমবাবু সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

বলতেই হবে সংসদে প্রয়োজনীয় সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণববাবু ও একটা সময় চিদাম্বরম সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বিলটির স্বপক্ষে। ২০০৬ সালের বাজেট বক্তৃতায় প্রথম বিলটির কথা উত্থাপিত হয় আর ২০১১ সালে সংসদে বিলটি পেশও করা হয়। পূর্বতন ইউপিএ-র নানান কলঙ্কিত অধ্যায় ও সরকারের ল্যাজেগোবরে অবস্থার কারণে বিলটি পাশ হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। তবুও সংসদে পেশ হয়ে যাওয়ার ফলে তা অনেকাংশেই ভিত তৈরির ভূমিকা নিয়েছিল। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সরাসরি এটিকে বাতিল করার কোনো রাস্তা ছিল না।

তবু আইনে পরিণত হওয়ার মতো চরম মুহূর্তে পৌঁছতে দরকার হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর লোকসভায় বিপুল সংখ্যক সাংসদ নিয়ে জয় শুধু নয়, পরবর্তীকালে বেশ কিছু রাজ্যস্তরের নির্বাচনগুলিতে বিজেপির বিজয়ী হওয়া। এর ফলে রাজ্যসভাতেও সংখ্যা বাড়াতে সুবিধে হয়েছিল।

এরপরও প্রয়োজন হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর ইস্পাত কঠিন সংকল্পের এবং সঙ্গী অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির দলগুলিকে পক্ষে নিয়ে আসার, তাদের বিশ্বাস অর্জন করার বিপুল কৌশলের। তবেই বাস্তবায়িত হলো জিএসটি। তার মানে একথা কখনই বলা হচ্ছে না যে জিএসটি

স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে ভারত এই প্রথম এক বাজার সূত্রে আবদ্ধ হলো। এর ফলশ্রুতির অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। ভারতের নানান রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ওপর নানান বাজারে ভিন্ন ভিন্ন হারে কর আদায় বন্ধ হলে দেশের ব্যবসাক্ষেত্রে বিপুল সুবিধে হবে।

পাওয়া গেল তা একেবারেই অভূতপূর্ণ, সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। আদৌ তা নয়, বরং কিছুটা উল্টোই। যেমনটা ভাবা গিয়েছিল এটি ভীষণ সরল অর্থে একটি মাত্র কর হার, কেবল এক বছরই মাত্র কাগজ যা সারা দেশে একই ভাবে বলবৎ থাকবে তা পুরোপুরি নয়। সেতো আদর্শ পরিস্থিতি।

বিভিন্ন দলগুলির মতামত ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে কিছু দেওয়া নেওয়া অর্থাৎ পারস্পরিক আদান প্রদান না করলে তো সংসদে গিয়ে চূড়ান্ত মতৈক্যের যাকে বলে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করান তাও বিশ্বের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময় বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব হোত না। তাই লাগু হওয়া বর্তমান জিএসটি-র চরিত্র বোঝাতে এক কথায় বলতে হয় যতগুলি সম্ভাব্য আকারে এটিকে আইনে পরিণত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে চলতি চেহারাটিই বাকিগুলির থেকে ভাল।

তাহলে আমাদের এত আনন্দিত হওয়ারই বা কী আছে যখন আমরা ঠিক আমাদের প্রত্যাশিত বস্তুটিই পেলাম না। হ্যাঁ, এটিকে সাদরে গ্রহণ করার কারণ এটি নিশ্ছিদ্র না হলেও প্রচুর শুভ সম্ভাবনাময়। লাগু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ধাক্কায় জিএসটি এক ডজনের ওপর বিচিত্র ট্যাক্সকে বাতিল করে দিয়েছে। অবশ্যই ভারতের কর ব্যবস্থাকে নাটকীয়ভাবে সরল করে তুলছে জিএসটি। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করার যে স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর (Case of doing bussiness) এত গুরুত্ব দেওয়া হয় তা এক ঝটকায় অনেকটাই বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হবে।

এছাড়া বিশাল ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠী যে বহুবিধ জিনিসপত্র ব্যবহার করে থাকে তার ওপর বহুমাত্রিক কর-ব্যবস্থার যে ওপর থেকে নীচে নামার (caseading effect) হরেক রকম ফেঁকড়া ছিল তাও পুরোপুরি অপসারিত হয়ে যাবে এবং এই প্রক্রিয়া রূপায়ণের ক্ষেত্রে এমন বিধান (Provision) রাখা হয়েছে যাতে যারা কর কাঠামোর মধ্যে থেকে সৎভাবে ব্যবসা করবে, নানা ছলে কর ফাঁকিবাজদের থেকে তারা বাড়তি সুবিধে (incentive) পাবে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে ভারত এই প্রথম এক বাজার সূত্রে আবদ্ধ হলো। এর ফলশ্রুতির অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। ভারতের নানান রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ওপর নানান বাজারে ভিন্ন ভিন্ন হারে কর আদায় চালু বন্ধ হলে দেশের ব্যবসাক্ষেত্রে বিপুল সুবিধে হবে।

ইতিহাসে দেখা গেছে ১৮৮৭ সালে মার্কিন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রেল কোম্পানি এক এক রাজ্যে একচেটিয়া ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। এই সময় আন্তঃরাজ্য (Inter-state) বিভিন্ন মূল্যমান তুলে দিয়ে রাজ্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার জায়গায় যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) কাঠামো তৈরি করতে ১৮৮৭ সালের কমার্স অ্যাক্ট চালু হয়। এর পরিণতিতে আমেরিকার আলাদা আলাদা দেশীয় বাজারগুলির একটিই চরিত্র হয় আর এরই প্রভাবে ওই দেশ আজ বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক।

তাহলে, সেই বিরোধী দল যারা সদাই এই বিলটি প্রাথমিকভাবে সংসদে পেশ করার গৌরব নিজের দিকে টানতে কসুর করে না, বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলে ছেড়ে কথা বলে না, তারা এটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তের সমারোহে যোগদানের সুযোগ হারাল কেন? না না, এটি অজুহাত খাড়া করা এগুঁয়েমি প্রসূত নয়, যেমনটা অনেকে বলছেন। এটি আদতে খুব ঠাণ্ডা মাথার রাজনৈতিক হিসেব।

এই কূট হিসেবটি হলো কর ধাঁচায় এমন মৌলিক ও জটিল পরিবর্তনের ধাক্কা দেশের কর ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে পারে। এর ফলে ভুক্তভোগী মহলে গভীর অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে। তখনই ঘোলা জলে মাছ ধরার আদর্শ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আর সে সময় বুক বাজিয়ে বলা যেতে পারে, দেখ তোমাদের দুঃখের কথা ভেবেই তো আমরা উৎসব করতে যাইনি।

পেছন ফিরে তাকালে প্রধান বিরোধী দলটি বিগত তিন বছর ধরে একই আন্দাজ নিয়ে ঘুরছে। এই ঘটনা না হলে সেই ঘটনা, কোনো না কোনো সিদ্ধান্তে শাসকদল ফাঁদে পড়বেই। তখনই কোপ মারা যাবে। কিন্তু হায়! সার্জিক্যাল থেকে বিমুদ্রীকরণ কোনোটিই সরকারকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বা ব্যর্থ হতে দেয়নি! তাই জিএসটি'র ফলে সরকারের সঙ্কট তৈরি হবে এমনটা ভাবা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং যদি রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে হয় তাহলে তাদের অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণে কখন দলের মহাপতন ত্বরান্বিত করবে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। ■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090

9748978406

বাদুড়িয়া-বসিরহাটে হিন্দুদের উপর হামলা

সীমান্তবর্তী বসিরহাট এলাকা গত কয়েকদিন ধরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে উত্তপ্ত। অবশ্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ না বলে একে একতরফা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ বলাই শ্রেয়। আক্রমণের কারণ নাকি বাদুরিয়ার এক যুবকের একটি ফেসবুক পোস্ট। যুবকটি নাকি ফেসবুকে মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধে কুরুচিকর কথা লিখেছিল। বাদুড়িয়ার যুবকটি ফেসবুকে কুরুচিকর কথা লিখেছে বলে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল, তাহলে একই কথা লেখার জন্য শ্রীজাতকে গ্রেপ্তার করলো না কেন? বাকস্বাধীনতার কি দুরকম সংজ্ঞা? শ্রীজাতের জন্য একরকম আর বাদুড়িয়ার যুবকটির জন্য আর একরকম?

এবার আসা যাক বিষয়টি থেকে উদ্ভূত সাংবিধানিক প্রশ্নটিতে। রাজ্যপাল কি মুখ্যমন্ত্রীর কাজের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন? উত্তর হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রীর কাজের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া এবং অসাংবিধানিক কাজ হলে সেই কাজের নিন্দা করা এবং সেই কাজের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম কাণ্ডের সময় গোপালকৃষ্ণ গান্ধীও তাই করেছিলেন। তখন কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যপালের এই কাজকে সমর্থনই করেছিল। শাসনক্ষমতা লাভের পরই তৃণমূলিদের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে, আলঝাইমার রোগের চিকিৎসকদের জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। অন্য একটি সম্ভাবনার কথাও কিন্তু মনে উদিত হয়, রাজ্যপালের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এই আক্রমণ পরিকল্পিতভাবে রাজ্যবাসীর মনোযোগ ঘুরিয়ে দেবার জন্য নয় তো? আরও একটি ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মাথায় আসে, এতবড় অশান্তি তো রাতারাতি ঘটা সম্ভব নয়, দীর্ঘদিনের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি করে দ্বিতীয় দেশভাগের দামামা বাজাতে চাইছে না তো জিন্নার উত্তরসূরীরা? ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। বসিরহাটের ঘটনাটির মধ্যে ১৯৪৬-র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ছায়া দেখা যাচ্ছে। একদিকে আগ্রাসী মুসলমান বিভেদকামী শক্তি অন্যদিকে পক্ষপাতদুষ্ট সেকুলারিজমের মৌতাতে মগ্ন হিন্দুসমাজ। ৪৭-এও তো তাই হয়েছিল। সেকুলারিজমের মোহে হিন্দুরা ছিলেন নিদ্রামগ্ন অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থেকে ছুরি শানিয়েছিল মুসলমান গুণ্ডারা। আজও তো তাই হচ্ছে। সেদিনের সুরাবর্দির ভূমিকা নিখুঁতভাবে নিয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। সেদিনের মোহনিদ্রার চরম মূল্য হিন্দুদের দিতে হয়েছিল দেশভাগের মতো নিষ্ঠুর পরিণতিকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে। শ্যামাপ্রসাদের বদান্যতায় পাকিস্তানের গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই পেয়েছিলেন সেদিনের উদ্বাস্তু হিন্দুরা। আজ শ্যামাপ্রসাদ নেই, মুসলমান আগ্রাসনকারীদের পরিকল্পনা যদি আজ আবার বাস্তবায়িত হয় তবে আজকের বাঙালি হিন্দুর মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পাওয়াই অসম্ভব হয়ে উঠবে। বাঁচবার জন্য তাই আবেদন, হিন্দুরা আর নিদ্রামগ্ন থাকবেন না। চোখ বন্ধ করে থাকলে প্রলয়কে ঠেকানো যায় না।

—**অম্লানকুসুম ঘোষ,**
বালি, হাওড়া।

॥ ২ ॥

দেগঙ্গা, কালিয়াচক, ধুলাগড়, ক্যানিং ও বাদুড়িয়া দাঙ্গার মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল আছে। তাহলো পুলিশের ওপর আক্রমণ। এটা নানা কারণে অদ্ভুতও বটে। মুসলমানদের আক্রমণের টার্গেট সাধারণত হয় মন্দির এবং হিন্দুদের বাড়ি ঘর দোকান ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে ধর্ম ও সমাজ জড়িয়ে আছে, তাই এগুলোই টার্গেট হয়। কিন্তু পুলিশ তো না সাম্প্রদায়িক না ধর্মীয়। তাহলে তাদের উপর এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ কেন?



পুলিশ হলো কোনো দেশের প্রশাসনের (এক্সিকিউটিভ) শাখার একটা অংশ। এটার ওপর আঘাত দেশের শাসনযন্ত্রের উপর আঘাত বলেই বিবেচিত হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এই যে মুসলমানরা কেন দেশের শাসনযন্ত্রের ওপর আঘাত করছে? এটা কোন উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করছে?

আমার মতে এটা দেশের শাসনক্ষমতা দখল করা তথা দেশ থেকে বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টার দিকে ইঙ্গিত করছে। এটাই মনে হয় ভবিষ্যতে বাংলায় হতে যাচ্ছে। ছোট ছোট দাঙ্গায় পুলিশের ওপরে আক্রমণ দিয়ে হাত পাকানো হচ্ছে। এর পরে পুলিশ তথা দেশের শাসনযন্ত্রের উপর একটা বড়দরের আঘাত আসতে চলেছে। আজকে গ্রামে দাঙ্গা হচ্ছে। কালকে শহরে হবে। হয়তো লালবাজারের উপর হবে। কে বলতে পারে?

পুলিশকে দুইভাবে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। একটা ভিতর থেকে কার্যত দলদাসে পরিণত করে এবং নিষ্ক্রিয় রেখে। আর বাইরে থেকে মুসলমান জেহাদিরা দাঙ্গা করে শেষ করছে। এর ফলে একদিকে যেমন জেহাদি মুসলমানদের কনফিডেন্স বাড়ছে অন্যদিকে হবু জেহাদিদেরও কনফিডেন্স বাড়ছে। এছাড়া রাজ্যপালের উপরে আক্রমণ ভারত থেকে বাংলার বিচ্ছিন্নকরণের দিকে আরও একটা ইঙ্গিত। রাজ্যপাল হচ্ছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের যোগসূত্র। তিনি চলে গেলে বাংলা ভারত থেকে 'আন অফিসিয়ালি' বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাম দলগুলি আগে রাজ্যপাল পদটাই তুলে দিতে চেয়েছিল এবং আজকে তৃণমূলের শুভেন্দুরা রাজ্যপালের পদত্যাগ দাবি করছেন। আমার মনে হয় এই সবই বিচ্ছিন্নতাবাদের লক্ষণ।

—**অর্ণব ব্যানার্জী,**
কলকাতা।

গোরক্ষা-গোহত্যা ও আমরা

গোপীনাথ দে

দেশের সবচেয়ে বড় ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আশুতোষ লাহিড়ী ও অন্যান্য তাং ১৬৯৪। বকর ইদে গোরু কুরবানি অনাবশ্যক— এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কলকাতা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের এই আইন মান্য করার জন্য ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০১০ এবং ২০১১ এই পিটিশনে রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের ফয়সালা প্রযোজ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা কি আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জানেন না! যদি না জেনে থাকেন তবে দয়া করে জেনে নিন। আর যদি জেনেও ওই কথা বলেন তবে আগামীদিনে জনগণ জানিয়ে দেবেন আশা করছি।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় দেশে গোরু মহিষের মোট সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি এবং মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি অর্থাৎ মানুষ ও গবাদি পশুর অনুপাত ছিল ২ : ১। আজ গোরুর সংখ্যা (মহিষ-সহ) প্রায় ৯ কোটি আর মানুষের সংখ্যা ১২৫ কোটি। অর্থাৎ আজকের মানুষ ও গবাদি পশুর অনুপাত হয়েছে প্রায় ১৪ : ১। আমাদের দেশে প্রায় ১০০টি প্রজাতির দেশি গোরু কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০টি প্রজাতিতে। আমরা জানি সোনাব্যাঙ, কচ্ছপ, বিষধর সাপ, বিশেষ ধরনের হরিণ, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী সরকারের সংরক্ষণ তালিকায় রয়েছে। অথচ দেশি গোরু যা মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকারী সেগুলির একটার পর একটা প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই সরকারের।

বাম ফ্রন্টের আমলে দেশি প্রজাতির গোরু যাতে উৎপন্ন হতে না পারে তার জন্য প্রত্যেক ব্লকে 'ক্যাসটেটার' যন্ত্র পাঠিয়েছিল। এই ক্যাসটেটার যন্ত্র দিয়ে দেশি গোরুর পুরুষ বাছুর জন্মালেই তাকে নির্বীজ করে দেওয়া যায়। এই ভাবে দেশি গোরু বিলুপ্তির পথে এবং জারসি গোরুর চল হতে থাকে। অথচ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য জারসি গোরুর দুধের গুণমান দেশি গোরুর দুধের গুণমানের ৪০ শতাংশ মাত্র।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় মানুষ ও গোরুর যে অনুপাত ছিল সেটা যদি আজ বজায় রাখা যেত তাহলে বিদেশ থেকে গুঁড়োদুধ আমদানি করতে হোত না এবং শিশু-সহ সাধারণ মানুষ পুষ্টিকর দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে পেতে পারত এবং যে পরিমাণ গোবর ও গোচনা কৃষকরা পেত তার ফলে বিদেশ থেকে রাসায়নিক সার আমদানি করতে হোত না। ফলে জমি ভাল থাকত; জমি বন্ধ্যা হোত না। বছরের পর বছর রাসায়নিক সার রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমি বন্ধ্যা হয়ে পড়ছে। বন্ধ্যা জমিকে পুনরায় চাষযোগ্য করতে জৈব সার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার প্রয়োজন। আর সেটা করতে হলে গোরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই হবে। গোরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কৃষক পরিবারে বেকার যুবক অনায়াসেই কাজ পেয়ে যাবে।

সৌদি আরবে গোহত্যা নিষিদ্ধ। আমরা জানি, অতীতকালে আফ্রিকার উত্তর অংশ-সহ আরব দেশগুলি বনভূমি ও উর্বর কৃষি ক্ষেত্রে পূর্ণ ছিল। কিন্তু সেখানকার মানুষের আচার আচরণে ওই বনভূমি ও কৃষিক্ষেত্র মরুভূমিতে (সাহারা ও আরব) রূপান্তরিত হয়েছে। তাই আজকের আরব সরকার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গোশালা নির্মাণ করেছে আরব ভূমিতে। গোশালার গোময় ও গোমূত্র আরব ভূমিকে উর্বর ও শস্যশ্যামলা করে তুলবে এই উদ্দেশ্যে। বর্তমানে ইজরায়েল ও জাপান ইউরোপ থেকে জাহাজে করে গোময় গোমূত্র এনে নিজের নিজের দেশের জমিকে উর্বর করে রেখেছে।

ইউরোপের মানুষেরা গোমাংস ভক্ষণ করে কিন্তু নিজেদের গোরুগুলিকে হত্যা করে নয়। আমদানি করা গোমাংসই তারা ভক্ষণ করে। শুধু তাই নয় ইউরোপের মানুষেরা গোরুর প্রতি খুব যত্ন নেয়। গৃহপালিত গোরুগুলির প্রতিদিন দাঁত মাজার ব্যবস্থা করে। বিরাট বিরাট মশারি দিয়ে ঢেকে রাখে যাতে করে মশা-মাছির উপদ্রব থেকে রেহাই পায়।

আমাদের এই কলকাতাতেই চালু হয়েছে গোবর গ্যাস চালিত বাস এবং ভাড়াও খুব কম। আমরা জানি নিকট ভবিষ্যতে পেট্রলের উৎস পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যাবে। তখন এই গোবর গ্যাস মুখরক্ষা করবে। বৃদ্ধ গোরুগুলির গোময়-গোমূত্র দিয়ে সমাজের প্রভূত উপকার হবে, এমনকী বাস-লরিও চলবে।

গো-বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান— অনুরূপ গো-বিজ্ঞান। এবং এটি পড়ানো হয় এবং পরীক্ষাও নেওয়া হয়। এই বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র হলো নাগপুর। বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে যেহেতু এটা সাম্প্রদায়িক তাই এটাকে স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়নি। গো-বিজ্ঞানের তিনটি স্তর রয়েছে ছাত্রদের জন্য। যথা, প্রথম থেকে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত একটি কোর্স; ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর এবং নবম শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত তৃতীয় স্তর। শুল্ক মাত্র একশো টাকা। যে-কোনো ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে মানপত্র সংগ্রহ করতে পারে। যোগাযোগ করতে হবে নাগপুর কেন্দ্রে। আশা করছি আগামীদিনে স্কুল কলেজের পাঠ্য সূচিতে গো-বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ পঞ্চগব্য থেকে প্রায় ৪২টি ওষুধ নির্মাণ করা যায় এবং যেগুলি দিয়ে মানবদেহের প্রায় সব রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব, এমনকী ক্যানসারও নিরাময় সম্ভব। আমাদের সরকার ওইসব ওষুধের পেটেন্ট দেয়নি, কারণ ওসব সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। তাই আমেরিকা সরকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুফল পাওয়ার পর ওইসব ওষুধের পেটেন্ট দিয়েছে। আগামীদিনে গোরু এবং গোবিজ্ঞানের জয়যাত্রা কেউ আটকাতে পারবে না। সে যত বড় নেতা বা নেত্রীই হোন না কেন? ■



সীতা

অগ্নিপরীক্ষা থেকে পাতাল প্রবেশ

রাকেশ দাশ

রামায়ণ স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে ধর্মপথে মানুষের মার্গদর্শন করে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকে মর্যাদা পুরুষোত্তম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয়ের ধর্মসঙ্কটে তাঁর জীবন প্রতিটি মানুষের নিকট আদর্শ। তাঁর পূত জীবনচরিত শ্রবণে মানুষের পাপ নষ্ট হয়। তাঁর কীর্তিকে পাপহরা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বেদব্যাস অধ্যাত্মরামায়ণের শুরুতেই লিখেছেন, যে চিন্ময় পরমাত্মা পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান পাপের ভার হরণ করার জন্য নিজের মায়ায় মনুষ্য শরীর ধারণ করেছিলেন এবং যাঁর লীলা ও কীর্তি শ্রবণ মাত্রই পাপ নষ্ট হয় সেই জানকীশ রামচন্দ্রের ভজনা করি।

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ
সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ পুনরগাৎ ব্রহ্মাত্বম্
আদ্যং স্থিরাং
কীর্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং
জানকীশং ভজে।।

কিন্তু যে-কোনো ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে। মেকলে ও মার্কসীয়দের অপচেষ্টার ফলস্বরূপ প্রায় শতাব্দীকাল যাবৎ হিন্দু সংস্কৃতিকে ঔপনিবেশিক দাসসুলভ দৃষ্টিকোণ ও বিকৃত কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার একটি মানসিকতা তৈরি হয়ে হিন্দু সমাজে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। মাইকেল রামচন্দ্রকে ভিখারি রাঘব এবং নারী হরণকারী লম্পট রাবণ এবং তার সহায়ক মেঘনাদকে নায়ক বানিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বাহবা কুড়িয়েছেন। তার পরবর্তীকালেও সর্বত্র হিন্দুদের আস্থার প্রতীক স্বরূপ পাত্রগুলির চরিত্র হনন করা হয়েছে। শ্রদ্ধার স্থানগুলিকে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে কলুষিত করার আপ্রাণ অপচেষ্টা করেছে তথাকথিত প্রগতিশীলরা। তবে এতে বিশেষ দোষ নেই। এটি তাদের চারিত্রিক ত্রুটি যা মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ও মার্কসীয় দীক্ষার মাধ্যমে তাদের রক্তের গভীরে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক এবং নিজের প্রতি হীনমন্যতা ও ঘৃণা জাগানোর মানসিকতায় আচ্ছন্ন। নেশা ধরানো বিষের মতো এই মানসিকতা তাদের ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে এবং তারাও অন্যদেরকে এই নেশার পথে টেনে আনতে প্রয়াস করে চলেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই আবার নিজেদের নেশাগ্রস্ত জানার পরেও এই সর্বনাশা নেশার হাত থেকে মুক্তি পেতে উৎসাহী হয় না। এটিই রূঢ় বাস্তব।

কিন্তু, এর থেকে বড় সমস্যা হলো এই যে, ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলির বিচার যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়ে ওঠেনি। যাঁরা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণ করতে চেয়েছেন—বৈচারিক মাফিয়ারা তাঁদেরকে একঘরে করেছেন। তাঁদের কথার যুক্তিগ্রাহ্যতা বিচার করার বদলে তাদেরকে মধ্যযুগীয় মানসিকতা সম্পন্ন বা গৈরিক সন্ত্রাসের প্রবক্তা বলে চিহ্নিত করে সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। ফলে হিন্দুত্ব বিষয়ে সুস্থ আলোচনার বদলে একতরফা দোষারোপণই হতে থেকেছে।

রামচন্দ্রের চরিত্রও ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত রাবণবধের পরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও গর্ভিণী সীতাকে তপোবনে প্রেষণ রামচন্দ্রের চরিত্রের দুটি অবিস্মরণীয় কলঙ্ক রূপে বর্ণনা করে রামচন্দ্রকে নারীবিদ্বেষী অত্যাচারী দুশ্চরিত্র রূপে নিরূপণের প্রয়াস করা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা, হিন্দু দর্শনের দৃষ্টিকোণ নিয়ে এই বিষয়ে রামচন্দ্রের পক্ষে সওয়াল করার লোকের বড় অভাব। আমরা এই দুটি ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

অগ্নিপরীক্ষা :

লম্পট ও অত্যাচারী রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করার পর রামচন্দ্র যখন সীতাদেবীর সম্মুখীন হলেন তখন তিনি সীতাদেবীর সঙ্গে অত্যন্ত অপমানকর ব্যবহার করেন। রাবণের গৃহে বহুদিন যাবৎ বন্দিনী সীতার চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রামচন্দ্র তাঁকে ত্যাগ করার কথাও বলেন। সেই জনাকীর্ণ স্থানে এই দোষারোপণ নাটকের অভিনয় শেষ হলে রামচন্দ্র একটি শর্তে সীতাকে গ্রহণ করতে রাজি হন। শর্ত হয় সীতাকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি অপাপবিদ্ধা—তাঁর চরিত্র নিষ্কলুষ।

এই পরীক্ষার ফল কী হয়েছিল তা সকলেরই জানা।

একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে, অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা শ্রীরামচন্দ্রের চরম বিচক্ষণতার পরিচয়। বাল্যকাল থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাঁর মেলামেশা ছিল। তিনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ঋষি থেকে নিষাদরাজ গুহক পর্যন্ত সকলের সুহৃদ ছিলেন। সমাজের মানসিকতা তিনি খুব ভালভাবে জানতেন। সমষ্টিগত ভাবে সমাজ চিরকাল ব্যক্তির দোষ খুঁজে বেড়ায়। সম্ভবত, সমাজ তার মূল্যবোধগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবসময় খুঁতখুঁত নজরে সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করতে থাকে। যাতে ব্যক্তি সমাজের দোষদৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে সমস্ত কাজে সাবধানতা অবলম্বন করে। আবহমানকাল থেকে সমাজের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হলো পরনিন্দা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরনিন্দা নামক প্রবন্ধে এরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

রাবণের কারাগার থেকে উদ্ধৃত সীতার চরিত্র নিয়ে সমাজে কথা উঠবেই এটা তিনি জানতেন। অগ্নির থেকেও পবিত্র সীতা প্রজাগণের এই আচরণে অতীব দুঃখ পাবেন এটাও শ্রীরামচন্দ্র জানতেন। সেজন্য সমাজের প্রমুখ ব্যক্তিদের সামনে রামচন্দ্র অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে সীতার চরিত্রের প্রমাণপত্র নেওয়ালেন, যাতে সমাজে এই বিষয়ে কথা না ওঠে। কিন্তু, বাস্তবে এত কিছুর পরেও সমাজে এই ঘটনা ঘটেছে। একজন প্রজা নিজের পুত্রের মৃত্যুর কারণ হিসাবে সীতার অপবিত্রতাকে দায়ী করেছেন। অগ্নিপরীক্ষার পরেও!!!

তপোবনে প্রেষণ :

ঠিক এই ঘটনার সময়ে সীতা গর্ভবতী ছিলেন। সীতা শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্য সহধর্মিণী--- তেজস্বিতার প্রতিমূর্তি। অযোধ্যার সকলের আপত্তিকে যুক্তিজাল ও দৃঢ় সংকল্পের বলে নস্যাৎ করে তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছেন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার বলেই বন্দিনী অবস্থাতেও রাবণ দীর্ঘ এক বছরের সময়কালের মধ্যে তাকে স্পর্শ করতে সাহস করেনি। হনুমান তাকে চুপিচুপি নিয়ে আসতে চেয়েছে। তিনি আসেননি। তিনি জানেন যে, লঙ্কা থেকে পালানো নয়— প্রয়োজন নারীধর্ষক, দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী রাবণ ও তার রাক্ষুসে মানসিকতার সংহার। তিনি হনুমানকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে সে বানর সেনা সহিত রামচন্দ্রকে নিয়ে শীঘ্র ফিরে আসে। রাবণকে ধ্বংস করার কাজে রামচন্দ্রের প্রধানতমা সহায়িকা হয়েছেন তিনি। তিনি সাধারণ মানবী নন। তিনি রাজা রামচন্দ্রের পত্নী মহারানি সীতা। রামরাজ্যের সম্রাজ্ঞী তিনি। এহেন সীতা যখন জানবেন যে প্রজা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান তখন তিনি কী পদক্ষেপ নিতে পারেন সেটা কল্পনার অতীত। তবে সেটা নিঃসন্দেহে অগ্নিপরীক্ষার থেকে কঠোরতর কোনও পদক্ষেপ হবে এটা তো নিশ্চিত।

রামচন্দ্র একদিকে রাজা, অন্যদিকে গর্ভবতী প্রাণপ্রিয়া ভার্যার পতি। তিনি প্রজার আক্ষেপের কথা না জানিয়ে সীতাকে চুপিসারে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন তপোবনে। সেখানে তপস্যার প্রভাবে সিংহ আর হরিণ একসঙ্গে খেলা করে। লৌকিক কলুষ সেখানে প্রবেশ করে না। সেখানে সকলে নির্ভয়। সেখানেই তাঁর হবু পুত্র শিক্ষালাভ করবে।

রামচন্দ্রের এই কাজ নিয়ে অন্যরা যে মনোভাবই পোষণ করুন না কেন, সীতা যে এর ঔচিত্য নিয়ে সন্দেহ করবেন না সেটা প্রায় তিন দশকের দাম্পত্যের পরে রামচন্দ্র জানেন। সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের সম্পর্ক পবিত্র, হার্দিক এবং অলৌকিক। সেখানে অপবিত্রতা, সন্দেহ, কামগন্ধের লেশ নেই--- আক্ষরিক অর্থেই স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত নিশ্ছল, নিঃস্বার্থ প্রেম সেই দাম্পত্যের ভিত্তি। রাজা রামচন্দ্র ও প্রেমিক পতি রামচন্দ্র একটি সন্তুলিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি সীতাকে কিছু না জানিয়ে তপোবনে পাঠিয়েছেন। সিদ্ধান্তের কথা সীতাদেবীকে জানাতে হলে প্রজার আক্ষেপের কথাও জানাতে হয়— যার পরিণাম অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকি এড়াতে পরবর্তীতে শ্রীরামচন্দ্র আর কখনও সীতাকে অযোধ্যায় আনতে চাননি। পত্নীকে ছাড়া যজ্ঞ অসম্ভব জেনে নতুন করে বিবাহ করেননি সীতাপ্রেমিক একপত্নীব্রতে দীক্ষিত শ্রীরাম। সীতাকে ফিরিয়ে আনতেও চাননি। এতদিন পরে কেবলমাত্র যজ্ঞের প্রয়োজনে সীতাকে অযোধ্যায় টেনে এনে তাঁর অপমান করতে চাননি তিনি। চিরবিরহিণী সীতাকে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করাতে চাননি।

কিন্তু বিধির অলঙ্ঘ্য বিধানে সীতা এসেছেন। অতি স্বাভাবিক ভাবেই তার ফল ভাল হয়নি। রামচন্দ্রের আশঙ্কা সত্য করে সীতা পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছেন--- অগ্নিপরীক্ষার থেকেও কঠিনতর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সেজন্য সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও তাঁর পরিত্যাগকে অতি সাধারণ দৃষ্টিতে কিংবা বামমনস্ক দৃষ্টিতে কিংবা আধুনিক অবান্তর নারীবাদী দৃষ্টিতে বিচার করা কতটা বাস্তবসম্মত তা সন্দিগ্ধ। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসে কাটিয়েছেন, নিজের জীবন বাজি রেখে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, ধর্ম ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য রাবণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন, রামরাজ্যের প্রবর্তন করেছেন সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে নারীবিদ্বেষী ও নীচ চরিত্রের বলে প্রতিপন্ন করে হয়তো কারও গায়ের জ্বালা মেটে কিংবা কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি হয়— সত্য কতটা প্রকাশিত হয় সেটা ভাববার কথা।

উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণ সকলের মনমতো নাও হতে পারে, সকলে মেনে নাও নিতে পারেন। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণের বিশ্লেষণ অপরাধ বা মূর্খতা তো নয়। বরং পরম শ্রদ্ধেয়, অলোকসামান্য একটি চরিত্রের সদর্থক বিশ্লেষণ। বিদগ্ধ সুধীমণ্ডলী মুক্তমনে বিষয়টি আলোচনা করবেন এমনটি আশা করা যায়।

(লেখক অধ্যাপক, সংস্কৃত অধ্যয়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড়, হওড়া)

নাট্যজগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

মন্মথ রায়

রূপশ্রী দত্ত



নাট্যস্রষ্টা হিসেবে মন্মথ রায় এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৯৯ সালের ১৬ জুন পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে তিনি এমএ করেন। ১৯২৫-এ এলএলবি ডিগ্রি নিয়ে আইন ব্যবসাও শুরু করেন। তিনি কিছুদিন মিউনিসপ্যালিটির মেয়র ছিলেন। অল্প বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর প্রথম নাটক 'বঙ্গে মুসলমান' যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি বিএ পড়েন। সেই নাটকটি বালুরঘাটে ইসিডি ক্লাবের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৯২৭-এ তিনি লেখেন পৌরাণিক নাটক 'চাঁদ সওদাগর'। চাঁদ সওদাগরের চরিত্রের মধ্যে রচনাকালের সমসাময়িক বিদ্রোহী প্রতিবাদী বাঙালি চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'কারাগার' নাটকে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দুর্ব্যবহারের সমালোচনা করেন। ব্রিটিশ সরকার এই নাটক নিষিদ্ধ করেছিল।

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তিনি নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত পরবর্তীকালের নাটকগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। যেমন 'ধর্মঘট' (১৯২৬), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'সাবিত্রী' (১৯৩১), 'অশোক' (১৯৩৩), 'মীরকাশিম' (১৯৩৮), 'খনা' (১৯৫৩), 'জীবনটাই নাটক' (১৯৫৩), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৫৩), 'লালন ফকির' (১৯৬৯)। তিনি অনেকগুলি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন।

মন্মথ রায় 'গিরিশ ঘোষ' ও 'ডি এল রায়' স্মৃতি বক্তৃতা দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৩ সালে। সঙ্গীত, নাটক, অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান ১৯৬৯ সালে। স্টেট অ্যাকাডেমি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল পুরস্কার ১৯৭১ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কৃত হন ১৯৭২-এ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেয় ডি লিট উপাধি।

তাঁর নাটক সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী বলেন— 'মন্মথ রায়কে দীনবন্ধু মিত্রের প্রকৃত উত্তরসূরি বলা যায়।' খ্যাতনামা পরিচালক ও অভিনেতা উৎপল দত্ত বলেছেন, 'মন্মথ রায় যথোপযুক্তভাবে, ধ্রুপদী ভাবধারা এবং আধুনিক ভাব ও ভাষাকে তাঁর নাটক সন্নিবিষ্ট করেছেন।' তিনি দুটি পালা রচনা করেন। বংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁর তিনটি নাটক আছে। ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন— 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে মনে রেখে তিনি লিখেছেন 'আমি মুজবি নই' এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন— 'স্বাধীনতার ইতিহাস।'

মন্মথ রায়ের গুণগ্রাহী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ১৯২৬-এর ৪ঠা জুলাই মন্মথ রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন —'এক বুক কাদা ভেঙে এক দীঘি পদ্ম দেখলে, মনে যে আনন্দ হয়, আপনার নাটক দেখলে ও পড়লে মনে সেই আনন্দের উদয় হয়।' এই ভাবেই নাট্যকার মন্মথ রায় বাংলা নাট্য সংস্কৃতি জগতে এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ রূপে আজও বিরাজিত আছেন নাট্যপ্রেমী দর্শকদের মনে। তিনি ১৯৮৮ সালে লোকান্তরিত হন।

JAYA SHREE
THE NAME THAT IS INTERWOVEN
WITH TEXTILES THE WORLD OVER

PURE LINEN AND LINEN BLENDED FABRICS
HIGH PERFORMANCE FLAME RETARDANT FABRICS
WORSTED YARNS LINEN YARNS

GRASIM INDUSTRIES LTD.
JAYA SHREE TEXTILES

Rishra, P.O. - Prabasnagar - 712249, Dist.- Hooghly, West Bengal, India

পোশাকের স্বল্পতাই আধুনিকতা নয়

সুতপা বসাক ভড়

সময়ের সঙ্গে আমরা এগিয়ে চলেছি। সময় যেমন কারোর জন্য থেমে থাকে না, তেমনি আমাদের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা নানান ভাবে যুগোপযোগী হয়ে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হয়ে চলেছে। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য থেকেই যায়। তা হলো আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচিতি— এই পরিচিতিকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। জোর করে এর বিরুদ্ধে যাবার ফলও সুখকর নয়। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই আমরা রাষ্ট্রীয় পরিচিতি অস্বীকার করেছি, বিরোধিতা করেছি, তখনই আমাদের অধোগতির সূত্রপাত হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারোর কথা মনে হলে, তার সম্বন্ধে যে ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে ওই ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদেরও একটি সম্পর্ক থাকে। বেশভূষা শালীন এবং পরম্পরাগত হলে আমরা যেমন তাকে সহজেই মেনে নিতে পারি, সেইরকম অশালীন, বেয়াড়া পোশাকের কাউকে আমরা আমাদের পছন্দের তালিকার বাইরে রাখতেই স্বস্তিবোধ করি। কোনো ব্যক্তির পোশাক তার নিজের, পরিবারের, সমাজের তথা তার দেশের পরিচয় বহন করে। সেজন্য, পোশাক নির্বাচন এবং পরিধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত। বিশ্বায়নের যুগে একজন মডেল বা অভিনেত্রীকে একটি নির্দিষ্ট পোশাক পরতেই হয়। তাই বলে দেশের সমস্ত নারীকেই ওই পোশাকটি পরতে হবে— এমন দিব্যি কেউ দিতে পারে না। সংস্কৃতি, বয়স, চেহারা, পারিপার্শ্বিক স্থিতি সব কিছু বজায় রেখে পোশাক নির্বাচন করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আধুনিকতার নামে স্বল্পবাস ভারতের সংস্কৃতি বিরুদ্ধ। সেজন্য মায়েরা যখন বাড়ির মেয়েদের পোশাক কিনতে যান, তখন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা মাথায় রাখতে হবে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে বাজারে বেশ আকর্ষণীয় পোশাকের বাহার রয়েছে, তার মধ্যে যা আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে না, মেয়েদের সেরকম পোশাক নির্বাচন করা উচিত। তাদের রুচি অনুরূপ ভাবে গড়ে তোলার জন্য বাড়ির মা-কাকিমা-জেঠিমাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

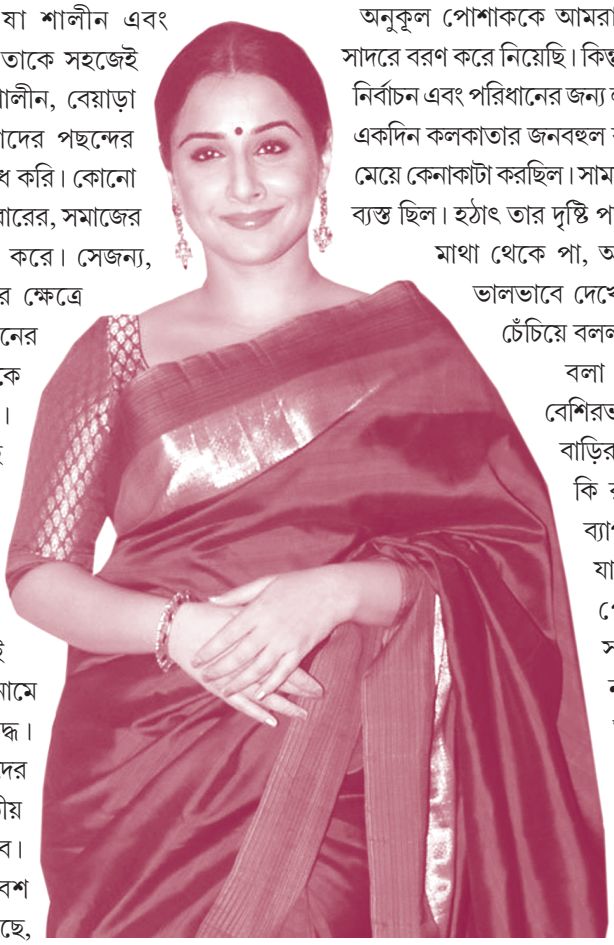

আধুনিকতার পরিভাষা একেকজনের কাছে একেকরকম। আধুনিকতার নামে অনেকে পোশাক ছোট করে ফেলছে। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ দিনে দিনে ছোট হয়ে চলেছে। আঞ্চলিক পোশাকগুলিও পাশ্চাত্যের অনুকরণে অঙ্গ-প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। সালোয়ার কামিজের সঙ্গে অভিন্ন ওড়নার ব্যবহার বন্ধ হতে চলেছে; অথচ ওড়না সৌন্দর্য, শালীনতা এবং সভ্যতার প্রতীক। এর ওপর আছে শরীরের সঙ্গে এঁটে বসা জিনস্। তাও ইচ্ছাকৃত ছেঁড়া-ফাটা। সেই ছেঁড়া ফাটা দিয়ে অনায়াসে দেহপ্রদর্শন চলছে— এই কি আধুনিকতা? কয়েকবছর আগে পর্যন্ত যেসব বস্ত্র ছিল অন্তর্বাস, আজ সেই পোশাকে বাইরে বেরুনোকে আধুনিকতা বলা হচ্ছে। ওইসব উত্তেজক পোশাক পরার উদ্দেশ্য এবং পরিণাম কি হতে পারে, আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? ওইসব পোশাক পরিহিতা মেয়েরা কু-দৃষ্টির শিকার হয় তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি?

অনুকূল পোশাককে আমরা সবসময় স্বাগত জানিয়েছি, সাদরে বরণ করে নিয়েছি। কিন্তু এখন, কিছু মহিলার পোশাক নির্বাচন এবং পরিধানের জন্য লজ্জা হয়। এই কি আধুনিকতা? একদিন কলকাতার জনবহুল বাজারে এক স্বল্পবাস পরিহিতা মেয়ে কেনাকাটা করছিল। সামনের হকার জিনিস বিক্রি করতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির ওপর। তারপর মাথা থেকে পা, আবার পা থেকে মাথা অবধি ভালভাবে দেখে পাশের হকারদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল— 'ভাল করে খেম্‌টা দ্যাখ্।' বলা বাহুল্য, মেয়েটির শরীরের বেশিরভাগই উন্মুক্ত ছিল। ওই অবস্থায় বাড়ির বাইরে বেরুতে তার একটুও কি রুচিতে বাধেনি? সুতরাং এ ব্যাপারে মহিলাদেরই দেখতে হবে যাতে বাড়ির মেয়েরা রুচিকর পোশাক কেনে এবং পরে। সামনেই দুর্গাপুজো, কেনা হবে নতুন জামাকাপড়। আসুন, আমরা আমাদের বাড়ির মেয়েদের সুন্দর, রুচিকর, শালীন, আরামদায়ক পোশাক কেনার ব্যাপারে উৎসাহিত করি। ■



বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

কথায় আছে, ছড়ানো দুধের ওপর শোক করে কী লাভ! লাভ বোধহয় আছে, না হলে আমাদের মহান ভারতে ছড়ানো দুধের ওপর শোকের মহরম এত জমবে কেন। বছরের পর বছর ধরে কাশ্মীরে একের পর এক নৃশংসতম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, আর শোকগাথার তুবড়ি ছুটছে। পাকিস্তানি চক্রান্ত, প্রক্সি ওয়র, পাকিস্তানি এজেন্টদের ড্যাস্টার্ডলি অ্যাক্ট, মার্ডারাস অ্যাসল্ট, কাওয়ার্ডিস অ্যাক্ট প্রভৃতি কথামালার কী বাহার। কিন্তু চক্রবৎ পুনরাবর্তন্তে সন্ত্রাস, তার আর কোনও প্রতিরোধ নেই। এমনকী চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কিন্তু আমাদের দেশের মহা মহা বুদ্ধিমন্তদের বুদ্ধি বাড়ার কোনও লক্ষণ নেই। যেন 'বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো পেট, লঙ্কা ডিঙোতে সবে মাথা করে হেঁট।'

কাশ্মীরের লাগাতার সন্ত্রাস-বিরোধী ঢপকেত্তন দেখে মনে পড়ে সেই বুড়ির গল্প; যেখানে বুড়িকে ঢিল ছুঁড়লে বুড়ি পরিত্রাহি চেঁচায়, আর ছেলেরা মজা দেখে। আমাদের এখানে পাকিস্তান সন্ত্রাসের ঢিল ছোঁড়ে, আর সরকারি, বেসরকারি মুখপাত্ররা শূন্য পেয়ালায় তুফান তোলে। একযুগ আগে অমরনাথযাত্রীদের সেই বীভৎস গণহত্যা কাণ্ডের পর এতদিন বাদে, আবার কী করে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যাত্রীবাহী বাসের রেজিস্ট্রেশন নেই, কিন্তু গাড়ি বিনা বাধায় সব চেকপোস্ট পার হয়ে যায়; রক্ষীবাহিনী ছাড়াই যাত্রীভর্তি বাস চলে।

সন্ত্রাস কবলিত রাস্তায় গাড়ির টায়ার স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে ফটাতেই পারে এবং সেটি সারাতে যথেষ্ট সময়ও নিতে পারে; কিন্তু তাই বলে, যাত্রীরা অরক্ষিত থাকবে কোন যুক্তিতে! এদিকে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, এনএসএ প্রভৃতি দেশরক্ষার অতন্দ্র প্রহরীদের সুরক্ষার বজ্র আঁটুনিতে এমন অবহেলার ফসকা গেরো যে, যে-কোনও সময় যে-কোনও ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু তাতে তাদের অপদার্থ হতাভাগা নিদ্রাভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নেই। সুরক্ষার অভাবে রাজীব গান্ধী বেঘোরে প্রাণ হারান আর ব্যর্থ গোয়েন্দাপ্রধান নারায়ণের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালরূপে পদোন্নতি হয়। বর্তমান জাতীয় সুরক্ষাপ্রধান দোভাল মশায়েরও কাশ্মীর কৃতিত্বের জন্যে পদোন্নতি আটকায় কে!

আসলে এই অমরনাথ যাত্রার ঘটনাতেই কাশ্মীরের বর্তমান অশান্ত অবস্থার ইঙ্গিত মেলে। মুসলমান অধ্যুষিত অমরনাথ তীর্থে, প্রতিপদেই মুসলমান, কিন্তু যাত্রীরা সবাই হিন্দু। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী শুধু যে স্বামী বিকেকানন্দ আরাধিত তুষারলিঙ্গের আবিষ্কারকই এক মুসলমান রাখাল তাই নয়, আজও প্রণামীর এক তৃতীয়াংশ প্রতি বছর যায় সেই পরিবারে। তাছাড়া যাত্রাপথে সরকারী, ঘোড়সওয়ার, মোড়ে মোড়ে মুসলমানের বিশ্রামালয়, এমনকী অমরনাথ পাহাড়ে পুজোর উপকরণও বিক্রি হয় মুসলমানের দোকানে।

কিন্তু আমাদের প্রায়ই ভুল হয় সম্প্রদায়ের সকলকে এককাতারে দেখা। আমাদের দেশে সেকুলার বজ্জাতি শুরু হয়েছে এই মুড়ি- মুড়কিকে এক করে দেখার চেষ্টা করে; মুসলমান মাফিয়ার খুন ধর্ষণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচে আড়াল করে। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ছোটো ইংরেজ ও বড়ো ইংরেজ বলে দুটি শ্রেণীর পার্থক্য বিচার করেছিলেন। তেমনি মুসলমানদের ভিতরে সুনাগরিক ধর্মাশ্রয়ী মুসলমান ও ধর্মান্ধ সমাজবিরোধী মুসলমান এবং সজ্জন মুসলমান ও গুণ্ডা মুসলমান এক করে দেখা ভুল। সংখ্যালঘু ভোট ভিক্ষায় দেখা যায় সেকুলার সতীরা ইমামদের দরগায় গিয়ে ধরনা দেয়, ইমামদের দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ফতোয়া ঝাড়তে সরকারি তোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সেকুলারিজমের নগ্ন ধর্ষণ বন্ধ রেখে এখন সময় এসেছে, তুঁষ থেকে ধান, আসলি থেকে নকলি, ধর্মান্ধ থেকে ধর্মাশ্রয়ী মুসলমানকে পৃথক করা এবং বজ্জাত মুসলমানের ওপর খড়্গহস্ত হওয়া। ভারত তথা বঙ্গদেশে যেখানে মুসলমান সংখ্যা বিপুল, সেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। বর্তমান বসিরহাট থেকে সেই ছেচল্লিশের দাঙ্গা অবধি দেখা গেছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব ছিল না। আসলে চিন্তা করতে হবে যে, সমস্যাটা মুসলমানদের নিয়ে নয়, বজ্জাত মুসলমান, ধর্মান্ধ মুসলমান, পোলিটিক্যাল মুসলমান, জাঙ্গি মুসলমান ও মাফিয়া মুসলমানদের নিয়ে। সেকুলারিজমের নলচে আড়াল দিয়ে এই সংখ্যালঘু বজ্জাতিকে শক্তহাতে মোকাবিলা করে আমাদের আবাহন করতে হবে সৎ ভারতীয় নাগরিক সমাজের প্রতিভূ এপিজে আবদুল কালামের অবির্ভাবকে।

প্রতিদিন নানা ছুতোনাতায় হিন্দুদের নির্যাতন করা হচ্ছে

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

বাসুদেব ধর রচিত 'সমসাময়িক প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কার্যকলাপের ফলে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্বিসহ অবস্থার কথা মর্মন্তুদ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থে প্রবন্ধের সংখ্যা মোট ১৩টি। প্রবন্ধগুলি গত বছর অর্থাৎ ২০১৬ লিখিত। লেখক বাংলাদেশের বাসিন্দা এবং সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত, ফলে তাঁর রচনাগুলি তথ্যনির্ভর ও বলিষ্ঠ। তিনি প্রতি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীরা যতই সংখ্যালঘুদের রক্ষার কথা বলুন তাঁরা আসলে মৌলবাদীদের হাতের ক্রীড়নক। ফলে যেমন মৌলবাদীদের প্রভাব যত বাড়ছে ততই সংখ্যালঘুদের জীবন দুর্বিসহ হচ্ছে এবং তাঁরা চোদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। লেখক শ্রীধর একটি সূত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন বাংলাদেশ হবার পর ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন অর্থাৎ বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন ৫২১ জন হিন্দু, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৪৩৮ জন, ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৭৬৭ জন হিন্দু, ২০০১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৬৭৪ জন হিন্দু নিরুদ্দেশ হয়েছেন। প্রতিদিন নানা ছুতোনাতায় হিন্দুদের নির্যাতন করা হচ্ছে। যেমন একটি হিন্দু ছেলে ফেসবুকে ইসলাম অবমাননা করেছে এই অভিযোগে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ পরে জানা গেছে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার বিষয়টি জামায়েত দলের সাজানো। এরকম গ্রন্থটির প্রতি পাতায় হিন্দু তথা সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি তাই সকলের অবশ্যপাঠ্য। আমরা লেখককে এমন প্রবন্ধসম্বলিত আরও গ্রন্থ লিখতে অনুরোধ করি। লেখকের ভাষা খুবই সাবলীল। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।



চট্টগ্রাম: মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাঈদীর রায় ঘোষনার পর বাশখালী সদরের শীলপাড়ায় জামায়াত শিবিরের ক্যাডারা তান্ডব চালিয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর লুটপাট করে ও জ্বালিয়ে দেয়। পোড়া ভিটেয় সর্বস্ব হারিয়ে আহাজারি করছেন দুলাল শীলের স্ত্রী নিপু শীল।

শ্রী অবনী রচিত 'মানব সংহিতা' গ্রন্থটি বলা যায় একটি বিশ্বকোষ। এতে সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা গ্রন্থিত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক জনগতি, ধর্ম, বেদান্তবাদ, ব্রহ্মবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ, ভারতে ইসলামের গোড়াপত্তন ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, সমাজ ও পরিবার ও ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেদ-পুরাণে সুর-অসুর, আর্য জাতি, বেদান্তের অর্থ ও সময়কাল, ব্রহ্ম, ইহকাল-পরকাল, অযোধ্যার রামমন্দির ও বাবরি মন্দির, ব্রাহ্মণদের গোমাংস ভক্ষণ, ইসলাম ধর্ম সংস্কৃতি, বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। লেখক প্রতি বিষয় তথ্য সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন যা পড়ে লেখকের অগাধ পাণ্ডিত্য বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা জাগায়। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

তৃতীয় সমালোচ্য গ্রন্থটির নাম 'মহাজাগরণ'। এটি শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিলিগুড়ি শাখার বার্ষিক সুভেনির। দীর্ঘ আয়তনের এই সুভেনিরে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি এই তিন ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ আছে। এই সুভেনিরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের উপর একাধিক প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলি খুবই হৃদয়গ্রাহী। সেই সঙ্গে অন্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধও আছে যা কম হৃদয়গ্রাহী নয়। প্রবন্ধগুলির মধ্যে লিখিত আত্মা-পরমাত্মা (লেখক— মুকুল বিকাশ মিশ্র), কপিলের সাংখ্যদর্শন (মণি রায়), গীতায় ত্রিমাত্রিক পুরুষ (ঊষারঞ্জন চক্রবর্তী), ধ্যানের উপযোগিতা (ভূপেন্দ্র চন্দ্র দাস), মহাভারতের কাহিনি আলোকে গান্ধীরী (নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এই সুভেনিরে বিভিন্ন কবির লেখা ১২টির মতো বাংলা কবিতা আছে যা পড়ে ভালো লাগে। হিন্দি ও ইংরেজি প্রবন্ধগুলিও লেখকদের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মোট কথা, পত্রিকাটি সাধারণ সুভেনিরের মতো নয়, এটি ব্যক্তিগত সংগ্রহের রাখার উপযোগী।

বাসুদেব ধর—সাময়িক প্রসঙ্গ। নিখিল প্রকাশন, ঢাকা। মূল্য : ১০০ টাকা, ২০১৭।

শ্রী অবনী—মানব সংহিতা। অভিষিক্তা পাবলিকেশন, কলকাতা, মূল্য : ১৫০ টাকা।

মহাজাগরণ (এ স্পেশাল এডিশন অফ সেন্টেনারি সেলিব্রেশন, ১৯১৭-২০১৭)-সম্পাদক স্বামী সত্যানন্দ, শিলিগুড়ি, ২০১৭।

অন্য রকম

ডাঃ বলওয়ান্ত ঘাটপাণ্ডে সেবায় নিয়োজিত শতায়ু চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১০২ বছরের ডাঃ বলওয়ান্ত ঘাটপাণ্ডে এখনও বাঁচতে ভালোবাসেন, মৃত্যুবরণও করতে চান এরকম ভালোবেসেই। এই বয়েসেও সপ্তাহে প্রতিদিন রোগী দেখেন। চিকিৎসা করা ছাড়া ভালোবাসেন বই পড়তে এবং টিভি দেখতে। তাঁর একান্ত ইচ্ছে এইভাবেই যেন একদিন চলে যেতে পারেন।

মৃত্যু নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে ডাঃ ঘাটপাণ্ডে সরাসরি বলেন, 'আমি চাই রোগী দেখার সময় আমার মৃত্যু হোক।' শতবর্ষ পেরনো একজন মানুষের কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখলে সত্যিই বেশ অবাক হতে হয়। এখনও তিনি সকাল সন্ধ্যে রোজ



রোগী দেখেন। পনেরো থেকে কুড়িজন মানুষের সমস্যার কথা মন দিয়ে শোনেন। বয়েস এবং প্র্যাকটিস নিয়ে কেউ কিছু বললে বেশ রেগে যান। প্রশ্নকর্তার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী বলতে চান আপনি? আমি এই পেশাকে ভালোবাসি তাই কাজ করি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করে যাব।' তাঁর জবাব সবসময়েই সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ। নিন্দুকেরা পালিয়ে বাঁচেন। চিকিৎসা করা মানুষটির পেশা হলেও, তার আড়ালে আসল কাজ হলো সেবা করা। এই সেবার জন্যে সমগ্র পুনে শহর তাঁকে চেনে। গরিব মানুষেরা তো সাক্ষাৎ ঈশ্বর মানেন।

১৯৪১ সাল। সেই বছর ডাঃ বলওয়ান্ত ঘাটপাণ্ডে পুনের বিজে মেডিকেল স্কুল থেকে এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এল এম এস অর্থাৎ লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি। ব্রিটিশ ভারতে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৮ তিনি সরকারি মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। সরকারি চাকরি কেন ছাড়লেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'গান্ধীজী যেবার মারা যান, আমি পাটানে (মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায়) পোস্টেড। সেই সময় আমারও জীবন সংশয় দেখা দিয়েছিল। তাই চাকরি ছেড়ে পুনে চলে এলাম।' তারপর প্রায় ৬৯ বছর ধরে তিনি পুনের বাসিন্দা। তাঁর ক্লিনিক রাস্তাপীঠ অঞ্চলে।

এই বয়েসেও তার বিশেষ কোনও অসুখবিসুখ নেই। তিনি বলেন, 'দরকার হয় না বলে আমি কখনও ডাক্তারখানায় যাই না।' কিন্তু এই সুস্বাস্থ্যের রহস্য কী? তাঁর জবাব, 'এখনও নিয়ম করে প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যায়াম করি। আমি শাকাহারী। বাইরের খাবার একেবারেই খাই না।' ডাঃ ঘাটপাণ্ডেকে কোনও সময়েই কাজ ছাড়া বসে থাকতে দেখা যায় না। অবসর সময়ে টিভি দেখা বা চিকিৎসা-সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা পড়ার পাশাপাশি তিনটে খবরের কাগজ রোজ পড়েন। নাটক দেখতে ভালোবাসেন। রামগণেশ গড়কড়ির 'একাচ পেয়ালা' তাঁর প্রিয় নাটক।

এরপরেই এসে পড়ে সেই বিতর্কিত প্রশ্নটি। এখনকার ডাক্তারদের সম্বন্ধে তাঁর কেমন ধারণা। তিনি বলেন, 'এখন চিকিৎসা-পরিকাঠামো বাজারি একটা ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করি ডাক্তারের ফিজ ঠিক ততটাই হওয়া উচিত যতটা রোগী বহন করতে পারে।' রোগী গরিব হলে ড. ঘাটপাণ্ডে ফিজ নেন না। এছাড়া বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসা ট্রাস্টে নিয়মিত চাঁদা দেন। যাতে আরও অনেক গরিব মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পান।

রমেশ সোনি ডাঃ ঘাটপাণ্ডের রোগী। তিনি বলেন, 'আমি তো বটেই আমার পরিবারের সকলেও ওকে বিশ্বাস করে। ওঁর হাতে ম্যাজিক আছে। পঞ্চাশ বছর ধরে ওঁর চিকিৎসায় আছি। রোগ সারাতে পারেননি এরকম কোনও ঘটনার কথা মনে করতে পারছি না।' ■



স্বামী স্মরণানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ সভাপতি হলেন স্বামী স্মরণানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদ তাঁকে এই পদে নির্বাচিত করে। এর আগে দীর্ঘ ১০ বছর তিনি সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বামী আত্মস্থানন্দের প্রয়াণের পর তিনি অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার আন্দামি গ্রামে। ১৯৫২ সালে ২২ বছর বয়সে তিনি সঙ্ঘের মুম্বই আশ্রমে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ১১ জুলাই ডোমজুড় খণ্ডের শাঁখারিদহ গ্রামের স্বয়ংসেবক বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বাড়িতে শ্রীহনুমান পূজা উপলক্ষে বিশ্বজিতের বাবা অজিত মণ্ডল সঙ্ঘের ডোমজুড় খণ্ডের কার্যবাহ রূপেন ব্যানার্জীর হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে খণ্ডের বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৫ জুলাই হাওড়া জেলার কুশবেড়িয়ার স্বয়ংসেবক কালীপদ মণ্ডল তাঁর নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে হাওড়া জেলা সঙ্ঘচালক রুধির রঞ্জন নায়েকের হাতে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচারক সুশীল কয়াল, অর্জুন বিশ্বাস, সব্যসাচী নস্কর, পিন্টু পাত্র, অপূর্ব ভট্টাচার্য-সহ বহু কার্যকর্তা।

শোকসংবাদ

প্রভু জগন্নাথ ভক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় গত ২৬ জুন সোমবার রাত ২-৪৫ মিনিটে পুরীধামে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। একান্ত ভক্তকে যেন প্রভু জগন্নাথ মুক্তির জন্য কোলে তুলে নিলেন। কৃষ্ণধন কলকাতার টালিগঞ্জ শাখার আবাল্য স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষিত, টালিগঞ্জ শাখার প্রাক্তন মুখ্যশিক্ষক, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, টালিগঞ্জ, পশ্চিম পুঁটিয়ারী অঞ্চলে বিজেপি নেতা হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। একবার কলকাতা পৌর সভায় এবং একবার বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। বাড়িতে কালীপূজায় নিমন্ত্রণ করে বহু লোককে খাওয়াতেন। এলাকার সমস্ত ক্লাব ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। প্রতি বছর রথযাত্রার সময় সপরিবার পুরীধামে যেতেন। এবারও সপরিবার এবং প্রতিবেশী কাউন্সিলর তথা কলকাতা পুর নিগমের মুখ্য সচেতক রত্না শূরকে সঙ্গে নিয়ে পুরীধামে গিয়েছিলেন। রত্না শূরের প্রচেষ্টায় সামরিক তৎপরতায় শবদেহ কলকাতায় আনা হয়। মরদেহে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এলাকার বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়। বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিংহ, শমীক ভট্টাচার্য বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী এবং স্থানীয় নেতৃবর্গ উপস্থিত থেকে মরদেহে শ্রদ্ধা জানান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি বৃদ্ধা মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, একমাত্র পুত্র-সহ বহু আত্মীয়স্বজন এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বরমুড়া গ্রামের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গত ৬ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৬ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ জেলার গাজোল নিবাসী 'জ্ঞানদা বই ঘর'-এর কর্ণধার গঙ্গেশ ঘোষ গত ১২ জুলাই পরলোকগমন করেন।



মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

গঙ্গেশ ঘোষ স্বস্তিকা ও বিশ্ব হিন্দু বার্তার দীর্ঘদিনের নিয়মিত পাঠক। তাঁর পরিবার সম্পূর্ণ সঙ্ঘময়। তিনি এক সময় গাজোল ব্লকের বিজেপি-র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। আমৃত্যু সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে। গাজোল মনমোহন শ্রীমতী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বর্তমানে গাজোল বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি। জামাতা সুব্রত রায় কলকাতা মহানগরের দক্ষিণ বিভাগ কার্যবাহ। তিনি স্ত্রী, একপুত্র, ৪ কন্যা, জামাতা নাতি, নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

এশিয় অ্যাথলেটিক্সে ভারত উদয়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স শীর্ষস্থান দখল করে আসন্ন লন্ডন বিশ্ব মিটের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস জোগাড় করে নিয়েছে ভারতীয় অ্যাথলিটরা। ভুবনেশ্বরে সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে চীন, কাতার, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাজাখাস্তানের মতো শক্তিশালী অ্যাথলেটিক্স দলকে পিছনে ফেলে অসাধ্য সাধন করেছে ভারতের ছেলেমেয়েরা। তবে এ প্রসঙ্গে বলতে হয় লন্ডন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এইসব দেশ সব ইভেন্টে তাদের সেরা অ্যাথলিটদের ভুবনেশ্বরে পাঠায়নি। প্রথম সারির সব অ্যাথলিট ট্রেনিংক্যাম্পে কঠোর অনুশীলনে ব্যস্ত। তবে চীন, জাপান, কাতার, কাজাখাস্তান অ্যাথলেটিক্সে ভারতের থেকে বহুগুণে এগিয়ে। তাই তাদের দ্বিতীয় সারির টিমও যথেষ্ট শক্তিশালী, অন্তত ভারতের তুলনায়। তাই এই পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্সে শীর্ষস্থান দখল করা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ পিছিয়ে থাকা দুর্বল একটি দেশের পক্ষে।

ভুবনেশ্বর মিট থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি দুজন। বাংলার হেপ্টাথলিট স্বপ্না বর্মণ ও হরিয়ানার জুনিয়র বিশ্ব পর্যায়ে বিশ্ব রেকর্ডধারী নীরজ চোপড়া। প্রায় দুবছর চোটের কবলে জাতীয় পর্যায়ে বড়সড় কোনো সাফল্য পাননি জলপাইগুড়ির স্বপ্না। এক সময় অনেক আশা জাগিয়ে শুরু করে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন প্রতিভাবান স্বপ্না। কিন্তু অপরিসীম মনের জোর আর বহুধা প্রসারিত স্বপ্নকে বিধৃত করে স্বপ্না কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে ট্রাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। আর ফিরে এসেই ভিনি-ভিডি-ভিসি— একেবারে এশিয়ান ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড সোনা। সাতটি ইভেন্ট নিয়ে গড়া হেপ্টাথলন এক অসম্ভব কঠিন ও কষ্টসাধ্য খেলা। সেখানে বড়মাপের চোট পাওয়ার পর ফিরে এসে মহাদেশীয় পর্যায়ে সোনা জেতা এক অনন্য কীর্তি। আর এই কীর্তির জন্য স্বপ্না সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানিয়েছেন সল্টলেক সাই সেন্টারের কোচ, ট্রেনার ও ট্রেনিং পদ্ধতিকে। অন্যদিকে নীরজ তাঁর ছায়া ক্রমশই মেলে ধরছেন এশিয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিবৃত্তে। তার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব দাবি করতে পারে অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত কোচ গ্যারি কালভার্ট।



স্বপ্না বর্মণ

কালভার্ট নিজেও জ্যাভেলিনে কমনওয়েলথ ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। পরবর্তীকালে কোচ হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে দেশে এই ফিল্ড ইভেন্টে বহু চ্যাম্পিয়ান থ্রোয়ার তাঁর হাতে তৈরি। এবার মিশন ভারতবর্ষ। সাইয়ের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছেন ভারতের জ্যাভেলিন থ্রোয়ারদের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ দিতে। তাঁর হাতে পড়ে নীরজ সম্পূর্ণ এক নতুন থ্রোয়ারে পরিণত হয়েছেন। গত বছর বিশ্ব যুব মিটে সোনা জেতেন বিশ্বরেকর্ড-সহ। এবার এশিয়ান সিনিয়র মিটে রেকর্ড-সহ পোডিয়ামের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান ভারতের অ্যাথলেটিক্সপ্রেমীদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কী সেই স্বপ্ন— বিশ্ব পর্যায়ে কোনো ভারতীয় অ্যাথলিটের স্বর্ণপদক জয়। একমাত্র অঞ্জু ববি জর্জ ২০০৩ সালে প্যারিস বিশ্ব মিটে লংজাম্পে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। এছাড়া কোনো ভারতীয় অ্যাথলিটের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি।

মনপ্রীত কউর এবারের এশিয়ান মিটে প্রথম সোনা জেতেন ভারতীয়দের মধ্যে। এছাড়া ভারতের মহিলা রিলে দলকেও বিশেষ কৃতিত্ব দিতে হবে এশিয়ান রেকর্ড ভেঙে সোনা জেতার জন্য।



নীরজ চোপড়া।

পুরুষ শর্টপুটে একদা কীর্তিমান বাহাদুর সিংহের সুযোগ্য ছাত্র হরলাল সিংহ স্বচ্ছন্দে জিতেছেন। এশিয়ার অন্য দেশের অ্যাথলিটরা এবার ভারতের দাপটের মধ্যেও অমূল্য লড়াই মেলে ধরেছেন। তবে প্রথম সারির তারকারা না আসায় আর দেশের মাঠে তুমুল জনসমর্থন মাথায় নিয়ে পারফর্ম করার যে সুবিধে তা পুরোমাত্রায় উশুল করে নিয়েছেন ভারতীয়রা। আর সাই এবং ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থাও যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে দিচ্ছেন আথলিটদের। সাবজুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র সব পর্যায়ে অ্যাথলিটরা বিদেশি কোচ, ট্রেনারের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ট্রেনিং ক্যাম্পে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ট্রেনিং প্রাপ্তিই ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের মান উন্নয়নের প্রেক্ষিত। তবে শুধু এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেই আটকে থাকলে হবে না, লক্ষ্যটা অনেক উঁচুতে স্থাপন করতে হবে অর্থাৎ বিশ্ব ও আন্তঃমহাদেশীয় মিট। তাহলেই অন্যান্য খেলাতে ভারত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতে উঠবে। ■

অন্ধদের বই পড়া

ডাক্তার মুনের নাম অনেকেই শুনেছেন। ১৮৩৫ সালে ইনি অন্ধ হন। সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। এতকাল ইনি অন্ধদের জন্য খেটেছেন; বিশেষত কেমন অক্ষরে বই ছাপা হলে তাদের পক্ষে বেশ সুবিধে, তার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছেন।



অন্ধেরা কীভাবে পড়তে পারে, একথা কেউ জিজ্ঞেস করতে পার। যাদের চোখ নেই, তারা যে আমাদের মতো চোখের সাহায্যে পড়তে পারে না, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। অন্ধেরা হাতের সাহায্যে পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যাদের একটা শক্তি নেই, আরেকটা শক্তি তাদের খুব প্রখর হয়, আর তা হওয়াও স্বাভাবিক। একটা শক্তি না থাকলে অপর একটা দিয়ে তার কাজ চালাতে হয়, কাজেই সেটার চালনা খুব বেশি হয়। চালনার ফলে শক্তি বাড়ে।

কোন জিনিসটা কেমন পরীক্ষা করতে হলে, তার উপর হাত বুলিয়ে দেখে। এভাবে বারবার হাত বুলিয়ে তাদের স্পর্শ শক্তিটা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হয়। অন্ধকে মুখে হাত বুলিয়ে মানুষ চিনতে নিজের চোখে দেখেছি। আমরা তা পারি না, কারণ আমাদের স্পর্শ শক্তির তেমন চালনা হয় না। অক্ষর যদি কালিতে লেখা না হয়ে খোদা হয়, তবে অন্ধ তাতে হাত বুলিয়ে, সহজেই তার চেহারাটা মনে করে নিতে পারে। অক্ষরগুলি খোদা না হয়ে, উঁচু হলে আর সুবিধে হয়।

অন্ধদের বইয়ের অক্ষর সব উঁচু-উঁচু। তাতে তারা হাত বুলিয়ে বেশ পড়ে যেতে পারে। তবে আমরা যেমন ছোট-ছোট অক্ষর পড়তে পারি, তারা তা পারে না। তাদের খুব বড় বড় অক্ষরের দরকার হয়। তোমাদের জন্য যেমন 'সখা ও সাথী' বের হয়েছে, অন্ধদের জন্য এর ষোলো-সতেরো খানার মতন এক-একখানা 'সখা ও সাথী' বের করলে তবে এর সব কথা তাতে ধরত।

অন্ধদের জন্য নানারকম লিখবার নিয়ম বের হয়েছে। মুন সাহেব সেগুলির দোষগুণ বিচার করে, তার চেয়ে অনেক সহজ উপায় বের করেছেন। এই নতুন উপায়ে এখন অনেক ছাপা হচ্ছে। তোমরা স্কুলে যতরকম বই পড়, তার সবই এখন অন্ধরা পড়তে পারে— তোমাদের অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি সব। অন্ধেরা ম্যাপ দেখে, ছবি দেখে, স্বরলিপি দেখে গান শিখে; সব ওই রকম উঁচু-উঁচু করে লেখা। তোমরা চোখে দেখ, তারা হাত বুলিয়ে দেখে।

অন্ধদের জন্য যে ছবি তৈরি করা হয়, তা তোমাদের ছবির মতো নয়। তাদের কোনোরকম রঙ নেই, একটি কালো লাইন পর্যন্তও নেই। যারা জন্মান্ধ, তারা তো কখনো রঙ দেখেনি। সুতরাং তা যে কেমন, তারা মনেও করতে পারে না। এ সম্বন্ধে মুন সাহেব যে গল্প বলেছেন, তা বলে আমরা এই লেখা শেষ করব।

লিখবার সময় আমরা যেমন লাইনের পর লাইন বাম দিক থেকে শুরু করে ডাইনে শেষ করি, অন্ধদের তাতে ভারি অসুবিধে হয়। ওরকম লেখা পড়তে তারা সহজেই পথ হারিয়ে ফেলে। অন্ধদের লাইন একটা আমাদের লাইনের মতন বাম থেকে ডানে, তার পরেরটা ফারসির মত ডান থেকে বামে, তারপরটা আবার বাম থেকে ডানে, এভাবে লেখা হয়। এভাবে হলে, যেখানে একটা লাইন শেষ হলো, সেখানেই আরেকটা লাইনের গোড়া পাওয়া গেল; খুঁজে বেড়াবার আর দরকার হয় না।

— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভারতের পথে পথে

কুরুক্ষেত্র

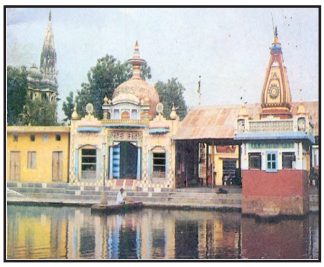

হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ এখানে হয়েছিল। এই স্থান দিল্লি থেকে উত্তরে এবং আম্বালা থেকে দক্ষিণে। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবরা লড়াইয়ের জন্য এই বিশাল প্রান্তরকেই বেছে নিয়েছিল। কথিত আছে ৪৮ কিলোমিটার জুড়ে এই বিশাল প্রান্তর ছিল। বর্তমানে কুরুক্ষেত্র শহরের মধ্যে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ দান করেছিলেন তা ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। কুরুক্ষেত্রে জ্যোতিসর তীর্থ, ব্রহ্মসরোবর, গীতামন্দির, কুরুক্ষেত্র মিউজিয়ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাইট অ্যান্ড সাউণ্ডের মাধ্যমে মহাভারতের যুদ্ধের দৃশ্যটি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রতিদিন শত শত মানুষ কুরুক্ষেত্র দর্শনে আসেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

যথা ভবান্ ইচ্ছতি।

তুমি যেমন চাইছ।

পরিহাসায় উক্তবান্ ভো:।

মজা করে বলেছি হে!

এষ: ভবত: অপরাধ: ন।

এতে তোমার কোনো দোষ নেই।

নৈব, চিন্তা নাস্তি।

না, কোনো চিন্তা নেই।

বয়ম্ ইদানীম্ অন্যগৃহে স্ম:।

আমরা এখন অন্য বাড়িতে আছি।

ভালো কথা

ঘুঘুপাখির বাসা

আমাদের ফ্ল্যাটের জানালায় মা তিনটে টবে তিনটে তুলসীগাছ লাগিয়েছে। তিনটি গাছই বড় হয়েছে। ঠাকুমা বলে তুলসীর হাওয়া খুব ভাল। ক'দিন আগে একটা ঘুঘুপাখি টবে বাসা করে দুটো ডিম পেড়েছে। ঠাকুমা বলল বাসার কাছে যাবি না, ভয় পাবে। ক'দিন পরে দেখি দু'টো লালটুকটুকে ছানা হয়েছে। মা ঘুঘুটি পেটের তলায় ওদের আদরে রেখেছে। একদিন দেখি একটা কাক জানালায় উঁকি দিচ্ছে। ঠাকুমা আমাকে বললো, বুড়ো আয় তো, পুরনো মশারি দিয়ে ঘিরে দিই। সেদিন দুপুরে আমি আর ঠাকুমা জানালার গ্রিল ঘিরে দিলাম। মা ঘুঘুটির কী বুদ্ধি! সিড়ির রাস্তা দিয়ে বাইরে যাওয়া আসা করছে।

পার্থপ্রতিম রায়, সপ্তম শ্রেণী, রায়গঞ্জ, মোহনবাটি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

লেখার ভাবনা

আকাশ ঘোষ, নবম শ্রেণী, সর্বমঙ্গলা পল্লী, মালদা

স্বস্তিকার পাতায় প্রকাশ হবে শুনে
কী লিখব ভাবছি একা বসে ঘরের কোণে।
লিখব নাকি ছোটো গল্প, লিখব ছড়া-রচনা
ক্রিকেট নিয়েও লিখেতে পারি, রয়েছে যা অজানা।
বিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে গিয়ে, হয়ে যাই যে অজ্ঞান
সমাজেরই কিবা বুঝি, লিখব সমাজবিজ্ঞান।
ভৌতিক কিছু লিখতে গেলে, ভূত যদি দেয় দেখা
ভয়ে তখন দায় হবে যে, একা ঘরে থাকা।
ইতিহাসের নেই তা বাকি, লিখা আছে যে সবি—
কবিতারই কিবা লিখব, নইতো আমি কবি।
তাই ভেবেছি স্বস্তিকাতে লিখব যে কিছু
শুধু অন্যের লেখা পড়ব না আর মাথা করে নীচু।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ৩৩

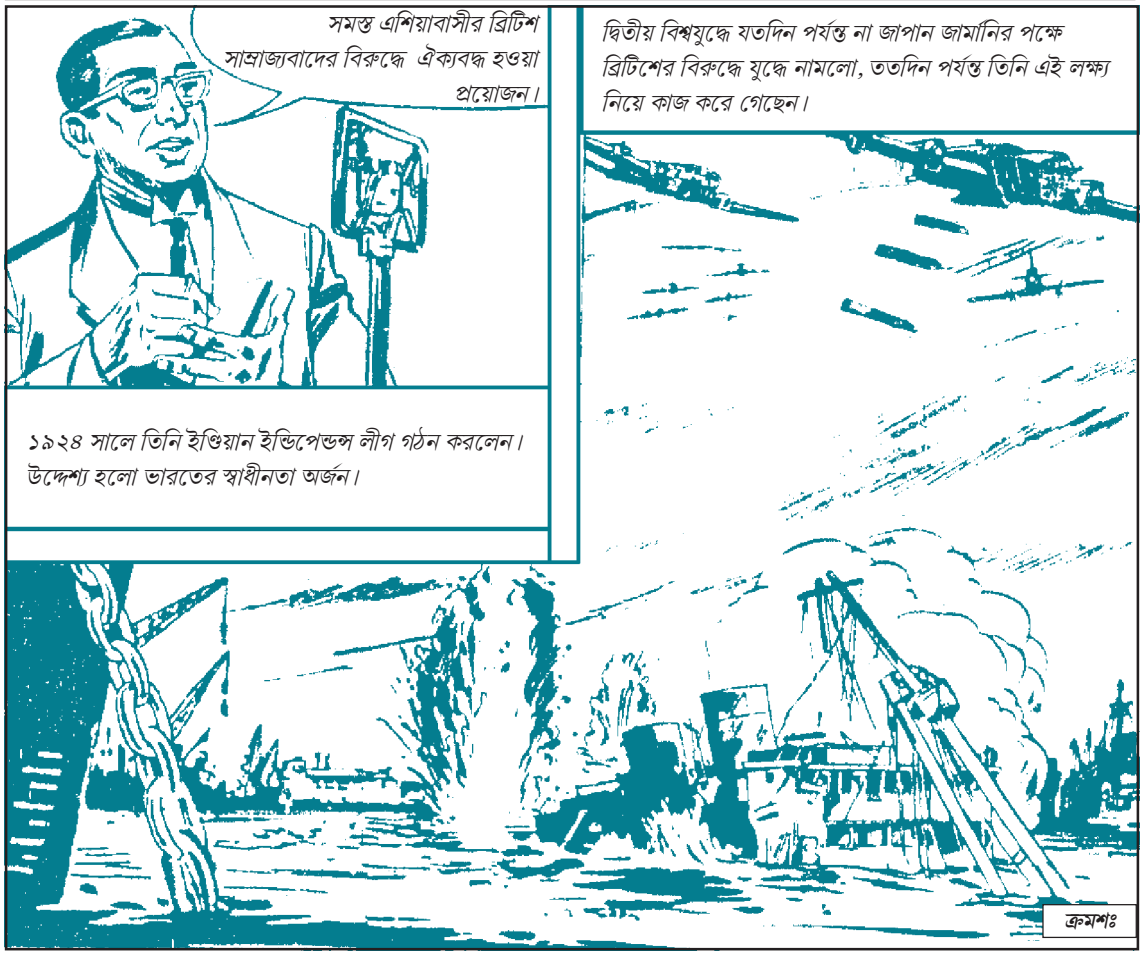

শব্দরূপ-৮৩৬ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

১	২		৩	■	৪	■	৫
■		■		■	৬		
৭				■		■	
	■	■	৮	৯		■	
	■	১০			■	■	
	■		■	১১		১২	
১৩			■		■		■
	■		■	১৪			

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ভারতের প্রাসাদ নগরী, ৬. ওষুধে ব্যবহৃত বিষতরু, ৭. অনুসারে, ৮. কাব্যের ব্যাঙ, ১০. ইগল জাতীয় পাখি, ১১. বনই যার বাসস্থান, ১৩. ঢাকের আওয়াজ, ১৪. মত্ত হস্তী।

উপর-নীচ : ২. দেবী দুর্গা, '— ওকে আজ চলে যেতে' ৩. পদবিতে জমিদার, ৪. 'অবাক জলপান' নাটকের রায় নাট্যকার, ৫. অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, ৭. 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' গানটির গীতিকার, ৯. যা সহজে আয়ত্ত করা যায় না, ১০. নীলপদ্ম, ১২. মজুর।

সমাধান : শব্দরূপ-৮৩৩

■	হা	ল	খা	তা	■	নী	লা
বা	ত	■	ম	ল	■	ল	■
বা	সা	■	■	ন	■	ক	■
■	ফা	■	অ	ব	গু	ষ্ঠ	ন
রা	ই	■	■	মী	ন	■	দী
না	■	বা	■	■	■	■	■
■	গা	ধা	খা	টু	নি	■	ক
■	■	ই	■	লি	■	■	ষ্ঠী

সঠিক উত্তরদাতা

শৈবাল সিংহ, বোলপুর, বীরভূম
সঞ্জয় পাল, সাহাপুর, মালদা

□ ৮৩৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ আগস্ট ২০১৭ সংখ্যায়

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
24 July - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA

Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread



The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in









*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com

Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।